বুদ্ধ-প্রসঙ্গ

মহেশচন্দ্র ঘোষ



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বুদ্ধপরিনির্বাণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

বৈশাখী পূর্ণিমা, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১১৯

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

৩'১

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের যে সকল মনীষী বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের অনুশীলন ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি গৌরবের আসন জ্ঞানতপস্বী মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮ - ১৯৩০) মহাশয়ের প্রাপ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার রচনাবলী পুরাতন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, এ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়া সুধীসমাজের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বুদ্ধ-পরিনির্বাণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমরা তাঁহার কয়েকটি রচনা এই পুস্তকে প্রকাশ করিতেছি, বুদ্ধ-প্রসঙ্গে তাঁহার আরও অনেকগুলি রচনা ভবিষ্যতে সংকলনের অপেক্ষায় রহিল। মহেশচন্দ্রের বৌদ্ধধর্মব্যাখ্যান সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহশীল তাঁহাদের জন্য প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত তাঁহার বৌদ্ধধর্মবিষয়ক রচনার তালিকাও পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। যে-তিনটি প্রবন্ধ এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা যথাক্রমে প্রবাসী পত্রের ভাদ্র ১৩৩০, ভাদ্র ১৩৩১ ও কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যা হইতে গৃহীত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থসংকলনে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ-বিনোদ গোস্বামীর পরামর্শেও আমরা উপকৃত হইয়াছি।

প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত লেখকের বৌদ্ধধর্মবিষয়ক কয়েকটি রচনা

১৩১৬

কার্তিক। বুদ্ধের ধর্ম

১৩১৭

বৈশাখ। ক্ষেমা-প্রসেনজিৎ সংবাদ

জ্যৈষ্ঠ। পরমবিমোক্ষ

শ্রাবণ। নিব্বান

১৩১৮

শ্রাবণ। বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ

ভাদ্র। বুদ্ধের ধর্মে ব্রহ্মের স্থান

আশ্বিন। দ্বিবিধ নির্বাণ

১৩২৫

ভাদ্র। বুদ্ধ ও পতঞ্জলি

১৩২৯

পৌষ। নির্বাণ কি ?

১৩৩০

ভাদ্র। গৌতম বুদ্ধের আত্মচরিত[১]

আশ্বিন। গৌতমের তপস্যা

১৩৩১

ভাদ্র। গৌতমের সাধনা ও সিদ্ধি[১]

১৩৩৩

পৌষ। বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকা

১৩৩৭

কার্তিক। নির্বাণতত্ত্ব[১]

১ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত

সূচীপত্র

গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত

সাধারণতঃ তিনখানা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গোতম বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয়। সে তিনখানার নাম: ১. অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ২. ললিতবিস্তর, এবং ৩. জাতকের উপক্রমণিকা। এই উপক্রমণিকা নিদানকথা নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেবের বহু পরে এই-সমুদায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই-সমুদায় পুস্তকে যে-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার অনেক ঘটনা কল্পিত, অনেক ঘটনা অতিরঞ্জিত, এবং অনেক ঘটনা অতিপ্রাকৃত। এ-সমুদায় পাঠ করিয়া গোতম বুদ্ধের প্রকৃত জীবনচরিত জানা যায় না।

ত্রিপিটক বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থ। কিন্তু এই ত্রিপিটকেরও বিভিন্ন স্তর আছে— কোনো অংশ অতি প্রাচীন, কোনো অংশ বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত জানিতে হইলে এই প্রাচীন অংশেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রাচীন স্তরে তাঁহার জীবন-বিষয়ে অনেক কথা পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে তিনি স্বয়ং ভিক্ষুগণের নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের আত্মচরিত বলিয়া যাহা পরিচিত, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিব।

১. পূর্বপুরুষ

গোতম স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, সূর্যবংশে তাঁহার জন্ম এবং ইক্ষ্বাকু রাজা তাঁহার পূর্বপুরুষ।

দীঘ-নিকায় নামক গ্রন্থে 'অম্বষ্ঠ সুত্ত' নামক এক অংশ আছে। এই সুত্তে লিখিত আছে যে এক সময়ে অম্বষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত গোতমের অনেক কথা হইয়াছিল। সেই সময়ে গোতম অম্বষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"হে অম্বষ্ঠ! শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু রাজাকে পিতামহ বলিয়া মনে করেন। ইক্ষ্বাকু রাজার এক প্রিয় 'মনাপ' মহিষী ছিলেন। রাজা ইহারই পুত্রকে রাজ্য দিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিমালয়ের পার্শ্বে কোনো পুষ্করিণীর তীরে এক মহাশাকবৃক্ষের সমীপে বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন। জাতি-সম্ভেদ-ভয়ে তাঁহারা অন্যত্র বিবাহ না করিয়া নিজ ভগিনীগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

"হে অম্বষ্ঠ! কিছুকাল পরে রাজা ইক্ষ্বাকু তাঁহার পারিষদ-অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমার কুমারগণ এখন কোথায় বাস করিতেছে?'

"অমাত্যগণ বলিয়াছিলেন, 'হিমালয়ের পার্শ্বে কোনো পুষ্করিণীর তীরে এক মহাশাকবৃক্ষ আছে। সেই স্থলে কুমারগণ বাস করিতেছেন। জাতি-সম্ভেদ-ভয়ে তাঁহারা নিজ ভগিনীগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন।' "

ইহা শুনিয়া রাজা ইক্ষ্বাকু এই উদান উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "ভো! কুমারগণ শক্য (শাকবৃক্ষবৎ দৃঢ়), কুমারগণ পরম শক্য।" দীঘ ৩।১৬

এই শাকবৃক্ষের নাম হইতেই শাক্যবংশের নাম হইয়াছে।

সুত্তনিপাত গ্রন্থের এক স্থলে (৯৯১) গোতম বুদ্ধকে "ইক্ষ্বাকুবংশের শাক্য পুত্র" (ওক্কাকরাজস্স শক্যপুত্ত) বলা হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থেরই অপর এক স্থলে লিখিত আছে যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর গোতম একদিন বিম্বিসারের রাজধানীতে ভিক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার জাতি কি?" ইহার উত্তরে গোতম বলিয়াছিলেন, "হিমালয়ের ঠিক পার্শ্বে ধনবীর্যসম্পন্ন কোশলবাসী এক জনপদ আছে। 'আদিত্য'

তাহাদিগের গোত্র এবং 'শাক্য' তাহাদিগের জাতি। আমি সেই কুল হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।" মহাবগ্‌গ, ৪২২

এখানে দেখা যাইতেছে যে, আদিত্য-বংশে অর্থাৎ সূর্যবংশে গোতমের জন্ম।

২. গোতমবুদ্ধের মাতাপিতা

দীঘ-নিকায় নামক গ্রন্থে 'মহাপদান' নামক একটি সুত্তন্ত আছে (১৪)। এই সুত্তন্তের বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। বর্ণিত আছে যে, তিনি এক সময়ে 'অবিহ' নামক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করিয়া নিজ নিজ পূর্বজন্ম ও প্রাচীন বুদ্ধগণের বিষয় বর্ণনা করিলেন। যাঁহারা গোতম বুদ্ধের কল্পে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। গোতম তাঁহাদিগের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপদান সুত্তন্তে বর্ণিত আছে। গোতম ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া সে বিষয়ে এইপ্রকার বলিয়াছেন—

"হে ভিক্ষুগণ! সহস্র সহস্র দেবতা আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে অভিবাদন করিল এবং অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করিল। তদনন্তর তাহারা এইপ্রকার বলিল, 'হে মারিষ! ভগবান্ এই ভদ্রকল্পে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্হং ও সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছেন। হে মারিষ! ভগবান্ ক্ষত্রিয়জাতীয় এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। হে মারিষ! ভগবান্ গোতমগোত্রী। হে মারিষ! ভগবান্ অশ্বত্থমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। হে মারিষ! সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান ভগবানের শ্রাবকদ্বয়; ইহারা অগ্র্য এবং ভদ্র। হে মারিষ! আনন্দ নামক ভিক্ষু ভগবানের উপস্থায়ক এবং

প্রধান উপস্থায়ক। হে মারিষ! রাজা শুদ্ধোদন ভগবানের পিতা (সুদ্ধোদনো রাজা পিতা); মায়াদেবী মাতা ও জনয়িত্রী; কপিলবস্তু (ইহাদিগের) রাজধানী (কপিলবৎথু নগরম্ রাজধানী)'।"—১৪।৩।৩০।

উদ্ধৃত অংশের কতটুকু সত্য আর কতটুকু মনঃকল্পিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। বুদ্ধদেব দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন—ইহার সত্যাসত্য বিচার আবশ্যক কিনা তাহা বিচারের মধ্যেই আসিতেছে না। সমসাময়িক লোকদিগের বিষয়ে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, সে-সমুদায়কে অসত্য বা অতিরঞ্জিত বলিবার কোনো কারণ দেখা যাইতেছে না।

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি যে, বুদ্ধদেবের পিতা একজন রাজা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধোদন রাজা ছিলেন না, তবে যে তাঁহাকে রাজা বলা হইত, তাহা কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু যখন বলা হইয়াছে তাঁহার রাজধানী ছিল তখন বলিতেই হইবে যে, তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন এ প্রকার মনে হয় না।

গোতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর একসময়ে বিম্বিসারের রাজধানীতে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে তাঁহার জাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে গোতম কি বলিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার উত্তর এই: "হে রাজন্! হিমবন্তের ঠিক পার্শ্বে কোশলনিবাসী ধনবীর্যসম্পন্ন এক জাতি আছে। তাহারা আদিত্যগোত্রী এবং শাক্যজাতীয়। কামভোগ অভিলাষ না করিয়া আমি সেই কুল হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।" সুত্ত, ৪২২, ৪২৩

এখানে দেখা যাইতেছে শাক্যগণ কোশল রাজার অধীন ছিলেন।

কোশল রাজার সহিত শাক্যবংশের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল তাহা

দীঘ-নিকায়ের অগগঞ্ঞ সুত্তন্তে (৮) বর্ণিত আছে। এখানেও বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। তিনি বসিষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"হে বসিষ্ঠ। শাক্যগণ রাজা প্রসেনজিৎ কোশলের অনুযুক্ত (অধীন)। শাক্যগণ রাজা প্রসেনজিৎ কোশলের অধীনতা স্বীকার করেন (নিপচ্চকারম্ বা নিপচ্চাকারম্), তাঁহাকে অভিবাদন (অভিবাদনম্) করেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান (পচ্চুট্ঠানম্) করেন, অঞ্জলিনিবদ্ধ হইয়া নমস্কার (অঞ্জলিকম্মম্) করেন এবং স্তুতিবন্দনাদি (সামীচী কম্মম্) করেন।" ৮।

এ অংশেও দেখা যাইতেছে, শাক্যগণ কোশল রাজার অধীন ছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, শুদ্ধোদন একজন রাজা ছিলেন ইহা সত্য কিন্তু তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না।— তিনি কোশল রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া নিজ রাজ্য শাসন করিতেন।

৩. ভোগবিলাস ও বৈরাগ্য

ভোগবিলাস

বাল্যাবস্থায় গোতম কি প্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করিতেন, তিনি নিজেই তাহা অনেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন। অঙ্গুত্তর-নিকায় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি একসময়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া এই প্রকার বলিয়াছেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি সুকুমার ছিলাম, পরম সুকুমার ছিলাম, অত্যন্ত সুকুমার ছিলাম। হে ভিক্ষুগণ। আমার জন্য পিতৃগৃহে অনেক পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। কোনো স্থলে উৎপল, কোনো স্থলে পদ্ম, এবং কোনো স্থলে বা পুণ্ডরীক উৎপন্ন হইত— এ-সমুদায় উৎপাদিত হইত

আমারই জন্য। হে ভিক্ষুগণ! কাশীর চন্দন ভিন্ন অন্য কোনো চন্দন ধারণ করিতাম না। হে ভিক্ষুগণ! আমার বেষ্টনও[১] কাশীর, কঞ্চুকও[১] কাশীর, নিবাসনও[১] কাশীর এবং উত্তরসঙ্গও[১] কাশীর। আমার মস্তকে দিবারাত্রি ছত্রধারণ করা হইত। শীত বা গ্রীষ্ম, ধূলি বা তৃণ বা হিম কিছুই আমাকে স্পর্শ কবিতে পারিত না। হে ভিক্ষুগণ! আমার জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল— একটি হৈমন্তিক, একটি গ্রৈষ্মিক, আব-একটি বার্ষিক (বর্ষাকালের জন্য)। হে ভিক্ষুগণ, বাষিক প্রাসাদে বর্ষাকালেব চারি মাস তূর্যবাদিনী নারীগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। তখন আর আমি প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতাম না। অপর গৃহে যখন দাস ও ভৃত্যগণকে বিড়ঙ্গমিশ্রিত কণাজক (=কণা অর্থাৎ খুদের ভাত) দেওয়া হইত, তখন পিতার গৃহে দাস ও ভৃত্যগণ শালিমাংসোদন (অর্থাৎ মাংস মিশ্রিত শালি-ধান্যের অন্ন) ভোজন করিত।" অঙ্গুত্তর-নিকায় দেবদূত বগ্‌গ, ৩।৩৮।১ ; মজ্‌ঝিম ৭৫

বৈরাগ্য

ক. উক্ত অংশের ঠিক পরেই গোতম তাঁহার মানসিক ভাবেব বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন—

"হে ভিক্ষুগণ! এই প্রকার ঋদ্ধিসমন্বাগত হইয়াও অত্যন্ত সুকুমার অবস্থাতেই আমার মনে এইপ্রকার চিন্তা আসিল—

১. 'অশিক্ষিত সাধারণ লোক নিজে জরাধর্মেব অধীন হইয়া রহিয়াছে। এবং জরাধর্মকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহারাও যদি অপরকে জীর্ণ দর্শন করে, তখন নিজ নিজ অবস্থা ভুলিয়া গিয়া আর্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করে। সেই সময়ে আমিও জরাধর্মের অধীন ছিলাম এবং

১ বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের নাম।

জরাধর্মকে অতিক্রম করিতে পারি নাই। জরার অধীন হইয়া এবং জরার অতীত না হইয়াও অপরকে জীর্ণ দর্শন করিলে আমার যদি আর্তি লজ্জা ও ঘৃণা হয়, তাহা আমার প্রতিরূপ হইবে না— বিশেষভাবে এই-প্রকার চিন্তা করিয়া যৌবনে যৌবনমদ বিনাশ করিয়াছিলাম।'

২. 'অশিক্ষিত সাধারণ লোক ব্যাধিধর্মের অধীন এবং তাহারা ব্যাধির অতীত নহে। তাহারাও যদি অপরকে ব্যাধিত দর্শন করে, তখন নিজ নিজ অবস্থা ভুলিয়া গিয়া আর্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করে। সেই সময়ে আমিও ব্যাধিধর্মের অধীন ছিলাম এবং ব্যাধিধর্মকে অতিক্রম করিতে পারি নাই। ব্যাধিধর্মের অধীন হইয়া এবং ব্যাধিধর্মের অতীত না হইয়াও অপরকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখিলে আমার যদি আর্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব হয়, তাহা আমার প্রতিরূপ হইবে না— বিশেষভাবে এই-রূপ চিন্তা করিয়া অরোগ অবস্থাতেই আরোগ্যমদ বিনাশ করিয়াছিলাম।'

৩. 'অশিক্ষিত সাধারণ লোক নিজে মরণধর্মের অধীন এবং মরণের অতীত নহে। তাহারাও যদি অপরের মৃত্যু দেখে, তখন তাহারা আর্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করে। সেই সময়ে আমিও মরণধর্মের অধীন ছিলাম এবং মরণধর্মের অতীত হইতে পারি নাই। মরণধর্মের অধীন হইয়া এবং মরণধর্মের অতীত না হইয়াও অপরের মৃত্যু দেখিলে আমি যদি আর্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করি তাহা আমার প্রতিরূপ হইবে না— বিশেষভাবে এইরূপ চিন্তা করিয়া জীবিতাবস্থাতেই জীবনমদ পরিহার করিয়াছিলাম।'" অঙ্গুত্তর-নিকায়, দেবদূত বগ্গ, ৩।৩৮।২।

খ. মজ্ঝিম-নিকায় নামক গ্রন্থে অরিয়-পরিয়েসনা (আর্য-পর্যেষণা) নামক একটি সূত্র আছে। ইহা গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত। শ্রাবস্তীর অন্তর্গত রম্যক নামক ব্রাহ্মণের আশ্রমে তিনি ভিক্ষুগণকে আত্মচরিত-বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই এই সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে

তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন—

"হে ভিক্ষুগণ! যখন সম্বোধি লাভ করি নাই, যখন অভিসম্বুদ্ধ হই নাই, যখন কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন স্বয়ং জাতিধর্মের (অর্থাৎ জন্মাদির) অধীন ছিলাম, এবং জাতিধর্মই আকাঙ্ক্ষা করিতাম; তখন স্বয়ং জরাধর্মের অধীন ছিলাম এবং জরাধর্মই অন্বেষণ করিতাম; স্বয়ং ব্যাধিধর্মের অধীন ছিলাম এবং ব্যাধিধর্মই অন্বেষণ করিতাম; স্বয়ং শোকধর্মের অধীন ছিলাম এবং শোকধর্মেরই অন্বেষণ করিতাম; স্বয়ং সংক্লেশধর্মের অধীন ছিলাম এবং সংক্লেশধর্মেরই অন্বেষণ করিতাম। তখন আমার মনে এইপ্রকার চিন্তা আসিল: 'কেন জাতিধর্মের অধীন হইয়া জাতিধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন জরাধর্মের অধীন হইয়া জরাধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন ব্যাধিধর্মের অধীন হইয়া ব্যাধিধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন শোকধর্মের অধীন হইয়া শোকধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন সংক্লেশধর্মের অধীন হইয়া সংক্লেশধর্মের অন্বেষণ করিতেছি? জাতিধর্মের অধীন হইয়া যখন জাতিধর্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অজাত অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। জরাধর্মের অধীন হইয়া যখন জরাধর্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অজর অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে লাভ করিতে হইবে। ব্যাধিধর্মের অধীন হইয়া যখন ব্যাধিধর্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অ-ব্যাধি অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যখন মরণধর্মের অধীন হইয়া মরণধর্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অমৃত অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যখন শোকধর্মের অধীন হইয়া শোক-ধর্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অশোক অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যখন সংক্লেশধর্মের অধীন হইয়া সংক্লেশধর্মের

দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে।' "

গ. ইহার পরেই গোতম বলিতেছেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি তখন দহর এবং শিশুর ন্যায় কৃষ্ণকেশ ছিলাম; তখন আমি প্রথম-যৌবনে উপনীত এবং ভদ্র-যৌবনপ্রাপ্ত। মাতাপিতা যদিও বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁহারা অশ্রুমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তথাপি আমি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া, কাষায় বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলাম।" মজ্‌ঝিম, ২৬।

ঘ. মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থ হইতে গ-অংশে যাহা উদ্ধৃত হইল, দীঘ-নিকায় গ্রন্থের সোণদণ্ড নামক সুত্তেও ঠিক সেই কথাই বলা হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, মজ্‌ঝিম-নিকায়ে বক্তা স্বয়ং গোতম, আর দীঘ-নিকায়ে বক্তা সোণদণ্ড নামক একজন ব্রাহ্মণ। সোণদণ্ড যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশ-বিশেষ এই—

শ্রমণ গোতম যখন দহর ও শিশুর ন্যায় কৃষ্ণকেশ ছিলেন, যখন তিনি প্রথম বয়সে উপনীত এবং ভদ্র-যৌবনপ্রাপ্ত, তখনই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাতাপিতা যদিও বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁহারা অশ্রুমুখ হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তথাপি তিনি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দীঘ, ৬।৬।

ঙ. অঙ্গুত্তর-নিকায় এবং মজ্‌ঝিম-নিকায় হইতে যে-সমুদায় অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই স্বয়ং গোতম বুদ্ধের উক্তি। অঙ্গুত্তর-নিকায় হইতে আমরা এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি—

১. গোতম বাল্যকালে ভোগবিলাসের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন।

২. জরা ব্যাধি ও মৃত্যু এই তিনটি বিষয়ে চিন্তা করিয়া তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন।

মজ্ঝিম-নিকায় হইতে এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে—

১. জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক সংক্লেশ— এই ছয়টির বিষয় চিন্তা করিয়া গোতম সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন।

২. তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেন নাই। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মাতাপিতা অশ্রুমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

৩. গোতম গৃহেই কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া এবং গৃহেই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দীঘ-নিকায় হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও এই শেষ দুইটা সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতেছে।

৪. প্রচলিত বিশ্বাস

কিন্তু প্রচলিত জীবনচরিতে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অন্যপ্রকার।

ক. চারিটি দৃশ্য

জাতকের নিদান-কথায় লিখিত আছে যে, গোতমের জন্মগ্রহণ করিবার পর পঞ্চম দিনে তাঁহার নামকরণ হয়। এই উপলক্ষে আটজন ভবিষ্যৎদর্শী ব্রাহ্মণ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সাতজন বলিয়াছিলেন যে, এই সন্তান হয় রাজচক্রবর্তী হইবে, না হয়, নূতন ধর্মের প্রবর্তক হইবে। কিন্তু কোণ্ডঞ্ঞ নামক অষ্টম ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "এ সন্তান বুদ্ধত্ব লাভ করিবেই, কিছুতেই গৃহে থাকিবে না।" তখন শুদ্ধোদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সন্তান কি দেখিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন

করিবে ?" কোণ্ডঞ্ঞ বলিলেন, "চারিটি পূর্ব-নিমিত্ত।" শুদ্ধোদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে চারিটি কি ?" কোণ্ডঞ্ঞ বলিলেন, "জরাজীর্ণ ব্যাধিত মৃত এবং প্রব্রজিত— এই চারিপ্রকার পুরুষ।"

ইহা শুনিয়া শুদ্ধোদন এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে সন্তান কোনো প্রকারে ঐ চারি প্রকার মানব দেখিতে না পায়। কিন্তু কৈশোর বয়সে ভাবী বুদ্ধ উদ্যানভূমিতে গমন করিবার সময় ঐ চারিটি দৃশ্যই দর্শন করিয়াছিলেন। লিখিত আছে যে, উদ্যানে যাইবার পূর্বেই পথ হইতে এ চারিপ্রকার লোককে অপসারিত করা হইয়াছিল। কিন্তু দেবগণ চারি দিনে যথাক্রমে ঐ চারিটি দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কয়েকটি দৃশ্য দর্শন করিয়াই গোতম সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই যে ঘটনা বর্ণিত হইল, ইহা দীঘ-নিকায় নামক গ্রন্থের মহাপদান সুত্তন্ত হইতে গৃহীত। কিন্তু এ ঘটনা ঘটিয়াছিল অন্য লোকের জীবনে। এই সুত্তন্তের বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। এই অংশে তিনি পুরাকালের ছয় জন বুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বিপশ্যী (পালি— বিপস্সি); ইঁহার পিতার নাম বন্ধুমান্ নামক রাজা এবং মাতার নাম বন্ধুমতী।

গোতমবুদ্ধকল্পের একনবতি কল্প পূর্বে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ঐ সময়ে লোকে আশি হাজার বৎসর জীবন ধারণ করিত। বিপশ্যীর জন্মগ্রহণ করিবার পরই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন যে, যদি এই সন্তান সংসারে থাকে তাহা হইলে রাজচক্রবর্তী হইবে, আর যদি সংসার ত্যাগ করে, তাহা হইলে অর্হৎ এবং সম্যক্-সম্বুদ্ধ হইবে। বন্ধুমান্ সন্তানের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন— একটি হৈমন্তিক, একটি গ্রৈষ্মিক, এবং একটি বার্ষিক। বিপশ্যী এই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে বাস করিতেন। একদিন উদ্যানভূমিতে গমন করিবার সময় বিপশ্যী একজন

জরাজীর্ণ পুরুষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার পর বিভিন্ন সময়ে তিনি আরও তিন বার উদ্যানে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে একদিন দেখিয়াছিলেন এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একদিন দেখিয়াছিলেন একজন মৃত ব্যক্তি এবং অন্য একদিন দেখিয়াছিলেন একজন ভিক্ষু। এই-সমুদায় দেখিবার পরে বিপশ্যীর প্রাণ সংসারের প্রতি বীতরাগ এবং মোক্ষলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। অবশেষে বিপশ্যী গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দীঘ, মহাপদান সুত্তন্ত।

গোতম বুদ্ধ এ-সমুদায়কে বিপশ্যীর জীবনের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উত্তরকালে এই-সমুদায় গোতম বুদ্ধের ঘটনা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে বিপশ্যী নামক এক বোধিসত্ত্ব যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ নাই। তাঁহার বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত, বুদ্ধচরিত লেখকগণ আবার এই মনঃকল্পিত ঘটনা-সমূহকেই গোতম-জীবনের ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কল্পনার উপর আবার কল্পনা!

গোতম বুদ্ধ চারিটি দৃশ্য কেবল চারি দিন দর্শন করিলেন, আর হঠাৎ তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। জীবনচরিত-লেখকগণ ঘটনাসমূহকে যে ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা ঠিক নাটকের দৃশ্য। তবে এ-সমুদায় অমূলক নহে। সাধারণ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই পূর্বোক্ত ঘটনা-সমূহকে নাট্যাকারে সজ্জিত করা হইয়াছে। এই দেহ জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন, জীবন দুঃখপূর্ণ, সংসার অশান্তিময়; এই-সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইবে— এই-সমুদায় ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়া গোতম প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই-সমুদায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ললিতবিস্তরাদি

গ্রন্থে পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঘটনাসমূহ সত্য নহে, কিন্তু ঘটনার মূলে যে ভাব, তাহা সত্য।

খ. যশ ও গোতম

ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারীগণ নৃত্যগীত-বাদ্যাদি দ্বারা গোতমের চিত্তবিনোদন করিত। এক রজনীতে গোতম এই নারীগণকে নিদ্রিতাবস্থাতে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বীভৎস রূপ দর্শন করিয়া তিনি সংসারের উপর বীতরাগ হইয়াছিলেন।

কিন্তু গোতমের জীবনে যে এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল, ত্রিপিটকের কোনো অংশে তাহাব উল্লেখ নাই। ঠিক এইপ্রকার একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছিল অপর এক ব্যক্তির জীবনে। বিনয়-পিটকের মহাবগ্‌গ নামক অংশের এক স্থলে (১।৭।৩) লিখিত আছে যে, গোতম বুদ্ধের সময়ে যশ নামক একজন শ্রেষ্ঠিপুত্র বাস করিত। তাহার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল— একটি হৈমন্তিক, একটি গ্রৈষ্মিক, এবং তৃতীয়টি বার্ষিক। বর্ষাকালের চারি মাস সেই যুবক বার্ষিক প্রাসাদের উপরিভাগে বাস করিত। তাহাকে নিম্নে কখনো অবতরণ করিতে হইত না। নারীগণ সর্বদা তাহার পরিচর্যা করিত, সে স্থলে অপর পুরুষের কোনো গতিবিধি ছিল না। এই ভাবে যশ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা কাম্যবস্তু উপভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছিল। একদিন সেই যুবক প্রথম রাত্রিতেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, অল্পে অল্পে নারীগণও নিদ্রায় আবিষ্ট হইল। ইহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্বেই যুবক জাগ্রত হইয়া উঠিল। তখন সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এই ভাবে বর্ণিত আছে—

"কোনো নারীর কক্ষে বীণা নিসঙ্গ, কাহারও কণ্ঠে মৃদঙ্গ সংলগ্ন, কাহারও কক্ষে আড়ম্বর নামক যন্ত্র নিবদ্ধ এবং কাহারও কেশ আলুলায়িত।

কাহারও মুখ হইতে লালা নিস্রুত হইতেছে এবং কেহ-বা প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে। মনে হইতেছে শ্মশান যেন হস্তগত (অর্থাৎ সমীপবর্তী) হইয়াছে।"

যখন যশ এই-সমুদায় দর্শন করিল, তখন তাহাব চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন সে বলিতে লাগিল—"কি উপদ্রব! কি উপসর্গ!"

ইহার পর যশ গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিল।

বিনয়পিটকে যশের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, বুদ্ধচরিত লেখকগণ তাহাই বুদ্ধজীবনের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পার্থক্য এই—ললিতবিস্তরের ঘটনা আরও বিস্তৃত ও বীভৎস।

সুতরাং বলা যাইতে পারে—

১. গোতম বুদ্ধের জীবনচরিতে যে বলা হইয়াছে, তিনি চারি দিন চারিটি দৃশ্য দেখিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন, ইহা গোতম বুদ্ধের জীবনের ঘটনাই নহে। এই ঘটনা গোতম-বর্ণিত বিপশ্যীর জীবনচরিত হইতে গৃহীত। বিপশ্যীর ঘটনা গোতমে আরোপ করা হইযাছে।

২. গোতমের বিষয়ে যে বলা হয় তিনি এক রজনীতে নিদ্রাভিভূতা নারীগণের অশোভন মূর্তি দর্শন করিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন, ইহাও গোতম-জীবনের ঘটনা নহে। এই ঘটনা যশ নামক একজন শ্রেষ্ঠিপুত্রের জীবনচরিত হইতে গৃহীত। যশের ঘটনাকে উত্তরকালে গোতমের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

এ-সমুদায় ঘটনা গোতম-জীবনের ঘটনা নহে, কিন্তু ইহার মূলে এইটুকু সত্য যে, তিনি জরা ব্যাধি মৃত্যু শোকাদি এবং সংসারের নানা প্রকার বীভৎস রূপ দর্শন এবং চিন্তন করিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন, এবং মোক্ষার্থী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গোতম বুদ্ধ নিজেও এই কথাই বলিয়াছেন।

গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি

গোতম ধন-ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ-বিলাস তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মপিপাসু ছিলেন। যখন তিনি গার্হস্থ্য অবস্থাতে ছিলেন তখনও তিনি অনেক সময়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন (মজ্‌ঝিম, মহাসচ্চক)। সংসারে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন— এই সংসার অনিত্য, এবং দুঃখ ও পাপে পূর্ণ। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, পাপ-তাপের অতীত এক নিরাপদ্‌ অচ্যুত পরম অবস্থা আছে। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন, এই অনিত্য ও দুঃখময় জগতের অতীত হইতে হইবে এবং সেই নিত্য পরমাবস্থা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু এই পরমপদ লাভ করিবার উপায় কি? ভোগবিলাসে ইহা লাভ করা যায় না, ইহা তিনি নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিলে হয়তো এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন।

আলাড় কালাম

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি আলাড় কালাম নামক একজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আলাড় কালাম একজন পরম যোগী ছিলেন। তিনি ধ্যানে এমন গভীরভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন যে, সে-সময়ে তিনি বাহ্যজগৎকে অতিক্রম করিতেন। মহাপরিনিব্বান সুত্তে লিখিত আছে যে, এক সময়ে পাঁচ শত শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তবুও তিনি যোগবিচ্যুত হন নাই। তিনি ইহা বুঝিতেই পারেন নাই যে, শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। গোতম এই প্রকার সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে

লাগিলেন। যোগসাধনে কালাম যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, গোতমও ততদূর অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার মনে হইল, এখানে এই যে ধর্মসাধন করিলাম, ইহা দ্বারা নির্বেদ বৈরাগ্য নিরোধ উপশম অভিজ্ঞা ও নির্বাণ লাভ করা যায় না, ইহা কেবল আকিঞ্চন্য-আয়তনের অবস্থা।

যে-অবস্থাতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সেই অবস্থার নাম আকিঞ্চন্য-আয়তন। এই অবস্থা শূন্যময়। পরে আমরা দেখিব যে, গোতম অনুভব করিয়াছিলেন যে, ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর অবস্থা আছে।

আলাড কালামের সাধন-প্রণালীতে গোতম সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

রাম-পুত্র উদ্দক

ইহার পরে তিনি রাম-পুত্র উদ্দক নামক একজন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। উদ্দকের যাহা-কিছু শিখাইবার ছিল, তাহা সমুদায়ই তিনি শিখিলেন। কিন্তু ইহাতেও গোতম পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এই প্রকার চিন্তা হইল—

আমি যে ধর্ম লাভ করিলাম, ইহাদ্বারা নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধ এবং নির্বাণ লাভ করা যায় না। এই অবস্থা কেবল সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা— এতদুভয়ের অতীত অবস্থা।

উরুবেলা

এইজন্য তিনি উদ্দকের আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরে তিনি মগধ দেশে উরুবেলা নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল— এই স্থান কি রমণীয়। অদূরে শুভ্রসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত

হইতেছে, এ স্থলে চিত্ত স্বভাবতঃই প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রামও সন্নিকটে, ভিক্ষারও বিঘ্ন হইবে না। এই স্থানই কুলপুত্রগণের সাধনের উপযুক্ত।

এই স্থানেই তিনি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তিনি দেখিলেন এ প্রকার তপস্যায় সিদ্ধিলাভের কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিলেন। ইহার অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নির্জন-সাধন

কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিবার পরও গোতম নির্জনে সাধন করিতেন। কিন্তু নির্জন-সাধন সহজ ব্যাপার নহে। এক সময়ে জাণুসোণি নামক একজন লোক গোতম বুদ্ধকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"হে গোতম! অরণ্যে বাস, প্রান্তরে অবস্থান অত্যন্ত কষ্টকর, নির্জনে কালাতিপাত অতি দুষ্কর, একাকিত্ব দুঃখময়। যে-সমুদায় ভিক্ষুর মন সমাধিতে মগ্ন হয় না, বনে তাহাদিগের প্রাণ উৎক্ষিপ্ত হয়।"

গোতম বলিলেন—

"হে ব্রাহ্মণ! ঠিক বলিয়াছ। যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, যখন কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন আমারও মনে এই প্রকার ভাব হইয়াছিল। যে-সমুদায় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য পরিশুদ্ধ হয় নাই, যাহাদের জীবিকা অপরিশুদ্ধ, যাহারা লোভপরায়ণ, কাম্যবস্তুতে যাহাদিগের তীব্র অনুরাগ, যাহারা হিংসাপরায়ণ ও যাহাদিগের সংকল্প প্রদূষিত, যাহারা আলস্যপরায়ণ ও নিশ্চেষ্ট, যাহারা উদ্ধত ও অশান্তচিত্ত, যাহাদের প্রাণ অনিশ্চিত ও সন্দেহপূর্ণ, যাহারা আপনাকে গৌরবান্বিত ও

অপরকে হীন করে, যাহারা ভীত ও স্তম্ভিত, যাহারা লাভ সংকার ও প্রশংসা কামনা করে, যাহারা কুসীদ ও হীনবীর্য, যাহাদিগের স্মৃতি বিভ্রান্ত ও যাহারা অসম্প্রজ্ঞ, যাহারা অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত, যাহারা দুষ্প্রজ্ঞ ও মূর্খ, সেই-সমুদায় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের পক্ষে অরণ্যে অবস্থান ও প্রান্তরে বাস ভয়ভৈরবপূর্ণ— যেহেতু তাহাদিগের জীবন অপরিশুদ্ধ। কিন্তু আমার সমুদায় কার্য পরিশুদ্ধ ছিল, কাম-লোভ-অহংকারাদি বিদূরিত হইয়াছিল, মৈত্রীভাব দ্বারা আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা আমি সম্যক্ অনুভব করিয়া অরণ্যে বিহার করিতাম এবং ইহাতে আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত।”—ভয়ভেরব সুত্ত।

ভয়ভৈরব-পরাভব

ইহার পরে গোতম বলিয়াছিলেন, “একদিন আমার মনে হইল রাত্রিতে অষ্টমী, বা চতুর্দশী বা পঞ্চদশী তিথিতে কোনো আরামের বনভূমিতে বা বৃক্ষসমীপবর্তী কোনো চৈত্যে গমন করিয়া সমুদায় রাত্রি বাস করিব। যদি লোমহর্ষণকারী ভয়ংকর স্থানে বাস করি তাহা হইলে ভয় ও ভৈরব কি তাহা অনুভব করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি এইরূপ স্থানে গমন করিতাম। যদি মৃগ বিচরণ করিত, পক্ষী যদি বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিত এবং তজ্জন্য বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ নিপতিত হইত, কিংবা যদি বায়ুপ্রবাহে শুষ্কপত্র সঞ্চালিত হইত— এই-সমুদায় শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইত, এই ভয়-ভৈরব আসিতেছে। তখন মনে করিতাম— আমি কেন ভয়ের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? যে-ভাবে ইহা আগমন করিবে, আমি সেই ভাবেই ইহাকে পরাভব করিব; আমার যে-অবস্থাতে এই ভয়-ভৈরব উপস্থিত হইবে আমি সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ইহাকে জয় করিব। যখন বিচরণ করিতাম, সেই সময়ে যদি ভয়-ভৈরব আগমন করিত তখন

আমি দণ্ডায়মান হইতাম না, বা উপবেশন করিতাম না, বা শয়ন করিতাম না, বিচরণ করিতে করিতেই সেই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত করিতাম। যখন দণ্ডায়মান থাকিতাম, তখন যদি ভয়-ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইত, তখন সেই অবস্থাতেই থাকিতাম, বিচরণ উপবেশন বা শয়ন করিতাম না। ভয়-ভৈরবকে পরাভূত করিতাম। এইরূপ যখন উপবিষ্ট থাকিতাম বা শয়ন করিতাম, তখন যদি ভয়-ভৈরব উপস্থিত হইত, আমি সেই-সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত করিতাম।"—মজ্ঝিম-নিকায়, ভয়-ভেরবসুত্ত।

ভয়কে অতিক্রম করিবার জন্য অল্পলোকই সাধনা করিয়া থাকেন। ইহা যে আবশ্যক, ইহার যে উপকারিতা আছে, এ প্রকার চিন্তা অল্পলোকের প্রাণেই উদিত হয়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা স্বভাবতঃই সাহসী। কিন্তু ইঁহারাও সম্পূর্ণরূপে ভয়কে অতিক্রম করিতে পারেন না। মনে কর, একজন সাহসী ব্যক্তি বনভূমিতে রাত্রিকালে অন্ধকারে অবস্থিতি করিতেছেন। হঠাৎ এক বিকট ভীষণ অশ্রুতপূর্ব ও অস্বাভাবিক শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন কি তাঁহার দেহমন অচঞ্চল ও নির্বিকার থাকিবে? মনস্তত্ত্ববিৎ প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পূর্বোক্ত ঘটনাতে সেই সাহসী ব্যক্তির প্রাণও অজ্ঞাতসারে ভয়ার্ত হইবে, তাহার দেহমন কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

এ প্রকার হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, মানব কেবল মানব নহে, মানব একাধারে পশু ও মানব। পশু চায় আত্মরক্ষা করিতে, ভয় সেই আত্মরক্ষার এক প্রধান উপায়। ভয় না থাকিলে পশুগণ জীবনরক্ষার জন্য সংগ্রামও করিত না কিংবা পলায়নও করিত না। মানুষ যে অনেক সময়ে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়, তাহার মূলে প্রাণ-ভয়। ভয় একটি পাশব সংস্কার; চিন্তা আসিবার পূর্বেই মানুষ এই সংস্কার-দ্বারা চালিত হইয়া

প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ এ স্থলে পশু, সংস্কারের অধীন। এই মানুষের স্বাধীনতা কোথায়, কোথায় তাহার স্বতন্ত্রতা?

মহাত্মা গোতম এই পশু-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই সাধনায় সিদ্ধও হইয়াছিলেন। তিনি ভয়-ভৈরবকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং দেহমনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবশে রাখিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই: "আমি আরব্ধ-বীর্য ছিলাম, আমি কখনো ভয়ে ভীত হইতাম না, আমার স্মৃতি সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত; কখনো অপ্রতিষ্ঠ হইত না। দেহ প্রস্তব্ধ থাকিত, কখনও চঞ্চল হইত না। চিত্ত সমাহিত ও একাগ্র থাকিত।"—মজ্ঝিম, ভয়-ভেরব সুত্ত।

দ্বেধা-বিতর্ক

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্বে গোতম পাপ তাপ দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বর্ণনা করিয়াছেন।—

কাম, ব্যাপাদ, হিংসা

দ্বেধা-বিতক্ক-সুত্তে লিখিত আছে যে, গোতম এক সময়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া এই প্রকার বলিয়াছিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, যখন আমি কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন আমার মনে এইপ্রকার ভাব হইয়াছিল— যখন আমার প্রাণে নানা প্রকার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই-সমুদায় ভাবকে দুই ভাগে বিভাগ করিনা কেন? দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে বিচার করিয়া দেখি না কেন? এই প্রকার স্থির করিয়া কাম, ব্যাপাদ (=অপরের অশুভ-কামনা, বিদ্বেষবুদ্ধি) ও হিংসা এই

কয়েকটি একদিকে রাখিতাম এবং নৈষ্কাম্য অব্যাপাদ ও অহিংসা এই কয়েকটিকে অপর দিকে রাখিতাম। তাহার পরে আমি অপ্রমত্ত, সাধন-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া এই ভাবে বিচার ও বিতর্ক করিতাম— এই কামবাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা নিজের অকল্যাণকর, ইহা অপরের অকল্যাণকর এবং ইহা উভয়ের অকল্যাণকর। ইহা প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং নির্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে কাম-বাসনা প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত।

"এইরূপ ব্যাপাদ ও হিংসা বিষয়ে চিন্তা করিয়া বুঝিতাম যে, এই-সমুদায় নিজের অকল্যাণ সাধন করে; অপরের অকল্যাণ সাধন করে এবং সকলের অকল্যাণ সাধন করে; এই-সমুদায় প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং নির্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে এ-সমুদায়ও প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত।

"অপরদিকে যখন নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইত তখন আমি ভাবিতাম, এই নৈষ্কাম্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিজের পক্ষে কল্যাণকর, অপরের পক্ষে কল্যাণকর এবং উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। ইহা প্রজ্ঞা বর্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে এবং নির্বাণলাভে সাহায্য করে। আমি রাত্রিতে এই প্রকার চিন্তা করিতাম, দিবাভাগে এই প্রকার চিন্তা করিতাম এবং দিবারাত্রি এই প্রকার চিন্তা করিতাম। এইরূপ অব্যাপাদ ও অহিংসার বিষয়ে বিতর্ক-বিচার করিয়া বুঝিতাম, এ-সমুদায় নিজের কল্যাণ সাধন করে, অপরের কল্যাণ সাধন করে এবং উভয়ের কল্যাণ সাধন করে; এ-সমুদায় প্রজ্ঞা বর্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ করে, নির্বাণ লাভে সাহায্য করে। রাত্রিতে দিবাভাগে এবং দিবারাত্রি এই প্রকার চিন্তা করিতাম।

"যে-যে বিষয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করা যায়, সেই-সেই বিষয়ের দিকেই

চিত্তের গতি হয়। নৈষ্কাম্যাদির বিষয় অনুক্ষণ চিন্তা করাতে কামাদি-বাসনা তিরোহিত হইয়াছিল এবং নৈষ্কাম্যাদি ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এই সমুদায় ভাবেব দিকেই আমার মনের গতি হইয়াছিল।"—মজ্‌ঝিম-নিকায়, দ্বেধা-বিতক্ক সুত্ত।

পঞ্চ-নিমিত্ত

ছন্দ (=রাগ, কাম্যবস্তু, ভোগে অনুরাগ), দ্বেষ ও মোহ নিবারণ করিবার জন্য গোতম পাঁচটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। এই পাঁচটি "নিমিত্ত" মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থের বিতক্ক-সন্থান সুত্তে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

প্রথম উপায়

যদি প্রাণে ছন্দ-দ্বেষ-মোহ মূলক পাপচিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রাণে কুশলচিন্তা আনয়ন করিতে হইবে। ঐ কুশল ভাব চিন্তা করিতে করিতেই পাপচিন্তা বিদূরিত হইবে। যেমন, মিস্ত্রী ক্ষুদ্র কীলক (খিল) দ্বারা বৃহৎ কীলককে বাহির করে, তেমনি কুশলচিন্তা দ্বারা পাপচিন্তাকে অপসারিত করা যায়।

দ্বিতীয় উপায়

ইহাতেও যদি পাপচিন্তা বিদূবিত না হয় তাহা হইলে ঐ পাপচিন্তার ঘৃণিত ও বিষময় ফলের বিষয় ভাবিতে হইবে; এই প্রকার করিলে পাপচিন্তা বিদূরিত হইবে।

যদি কোনো পুরুষ বা রমণীর কণ্ঠে সর্প বা কুকুর বা মনুষ্যের মৃতদেহ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণে ঘৃণা ও ন্যক্কার উপস্থিত হয়। তেমনি পাপের বীভৎস রূপের বিষয় চিন্তা করিলেও প্রাণে ঘৃণা ও ন্যক্কারের সঞ্চার হইবে।

তৃতীয় উপায়

ইহাতেও যদি পাপভাব বিদূরিত না হয় তাহা হইলে মনকে পাপচিন্তা হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ান্তরে লইতে হইবে।

যদি কেহ কোনো বস্তু দর্শন করিতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে সে চক্ষু নিমীলিত করে বা অপরদিকে দৃষ্টিপাত করে। তেমনি পাপচিন্তা উপস্থিত হইলে মনশ্চক্ষু নিমীলিত করিতে হইবে কিংবা অপরদিকে মনকে চালিত করিতে হইবে।

চতুর্থ উপায়

ইহাতেও যদি পাপচিন্তা বিদূরিত না হয় তাহা হইলে অভ্যাস-দ্বারা ক্রমশঃ মনকে পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে গোতম এই উপমা দিয়াছেন। মনে কর, এক ব্যক্তি দ্রুত গমন করিতেছে; সে মনে করিতে পারে— কেন আমি এত দ্রুত গমন করিতেছি, আমি তো শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে পারি। তাহার পরে সে যখন মৃদুগতিতে অগ্রসর হইবে তখন সে মনে করিতে পারে— কেন আমি এইভাবে অগ্রসর হইতেছি, আমি তো দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাবিতে পারে— আমি কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছি, আমি তো উপবেশন করিতে পারি। সে উপবেশন করিয়া ভাবিতে পারে— আমি কেন উপবেশন করিয়া রহিয়াছি, আমি তো শয়ন করিতে পারি। এই ব্যক্তি যে-ভাবে ধাবমান অবস্থা হইতে শয়নাবস্থাতে উপস্থিত হইল, আমরাও তেমনি পাপচিন্তা-বিষয়ে ভোগের অবস্থা হইতে নিরাহারের অবস্থায় আগমন করিতে পারি।

পঞ্চম উপায়

ইহাতেও যদি রাগ-দ্বেষ-মোহ-মূলক চিন্তা বিদূরিত না হয় তাহা হইলে দৃঢ়ভাবে দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিয়া, তালুতে জিহ্বাকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বলদ্বারা

চিত্তকে নিগ্রহ করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে পাপচিন্তা প্রাণ হইতে তিরোহিত হইবে, এবং চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হইবে।—মজ্ঝিম, ২০

গোতমও একসময়ে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি একসময়ে বলিয়াছিলেন, "দন্তে দন্ত সংলগ্ন করিয়া, তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট করিয়া এমন ভাবে বলের সহিত চিত্তকে নিগ্রহ করিতাম যে, আমার কক্ষ (বগল) হইতে ঘর্ম বিগলিত হইত।"—মজ্ঝিম, মহাসচ্চক সুত্ত।

গোতমের ধ্যান

ক. গৃহত্যাগ করিবার পর গোতম এই প্রকার নানা উপায়ে পাপবাসনা দূর করিয়া চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রকার প্রশান্তচিত্ত লইয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি বহুদিন এই অবস্থায় নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। এবিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—

"আমি দেহকে স্থির করিয়া বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, এক দিবারাত্রি, দুই দিবারাত্রি, তিন দিবারাত্রি, চারি দিবারাত্রি, পাঁচ দিবারাত্রি, ছয় দিবারাত্রি, এবং সাত দিবারাত্রি· ·বাস করিতে পারি।"—মজ্ঝিম, ১৫

খ. তিনি কি প্রকার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন তাহা মহাপরিনিব্বান সুত্তে বর্ণিত আছে। এক-সময়ে তিনি আতুমা নগরে তুষাগারে ধ্যানে মগ্ন হইয়া ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া দেখেন, সে-স্থলে মহা জনতা। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"সেই সময়ে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে এত জনতা কেন ?'

"সে বলিল, 'কিছুক্ষণ পূর্বে প্রবলবেগে গল্‌গল্ করিয়া বৃষ্টি বর্ষিত

হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, অশনি নিপতিত হইতেছিল, ইহাতে এই তুষাগারে দুই কৃষক-ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাদিগকে দেখিবার জন্য আতুমা নগর হইতে বহুলোক সমাগত হইয়াছে। এইজন্যই এই মহা জনতা।'

"তখন সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে ভদন্ত! আপনি কোথায় ছিলেন?'

"আমি বলিলাম, 'হে আয়ুষ্মান্! আমি এই স্থলেই ছিলাম।'

" 'আপনি কি সমুদায় দর্শন করেন নাই?

" 'হে আয়ুষ্মান্! আমি এ-সমুদায় দর্শন করি নাই।'

" 'হে ভদন্ত! আপনি কি সুপ্ত ছিলেন?'

" 'হে আয়ুষ্মান্! আমি সুপ্ত ছিলাম না।'

" 'হে ভদন্ত! আপনার কি সংজ্ঞা ছিল?'

" 'হে আয়ুষ্মান্! আমার সংজ্ঞা ছিল।'

" 'তাহা হইলে হে ভদন্ত! আপনি সংজ্ঞাবান্ ও জাগ্রত ছিলেন, আর তখন প্রবলবেগে গল্গল্ করিয়া বৃষ্টি নিপতিত হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, অশনি নিপতিত হইতেছিল, দুই কৃষক-ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ বিনষ্ট হইয়াছিল—আপনি এ-সমুদায় দেখেনও নাই, শুনেনও নাই!'

" 'হে আয়ুষ্মান্! ঠিক তাহাই।'

—মহাপরিনিব্বান সুত্ত, ৪।৩০-৩২

এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে, গোতম কি ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন।

গ. মনের উপর গোতমের এতই ক্ষমতা ছিল যে, তিনি ইচ্ছামাত্রই ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"আমার যখনই ইচ্ছা হইত তখনই আমি· ·প্রথম ধ্যানে,· ·দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে,· ·চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিহার করিতাম।"

—সংযুত্ত-নিকায়, কস্‌সপসংযুত্ত ৯

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

ক. আবিষ্কার

সর্বপ্রকার আশ্রব (সব্বাসব) বিনাশ করিয়া, চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া গোতম ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এই অবস্থায় তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সমুদায় সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছিল এবং নির্বাণলাভের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পথ আবিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"আমি চক্ষুলাভ করিয়াছি, আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি, প্রজ্ঞালাভ করিয়াছি, বিদ্যালাভ ও আলোকলাভ করিয়াছি।"—সংযুত্ত-নিকায়, ১২।৬৫।১০,১৮।

তিনি যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ জ্ঞান। তিনি ইহাকে প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক নাম দিযাছেন। এ-সমুদায়ের অর্থ এই যে, তিনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই পথ উদ্ভাবন করেন নাই, এ পথ স্বকপোলকল্পিত পথ নহে। ইহাতে কেহ-কেহ মনে করিতে পারেন, তবে বুঝি গোতমের ধর্ম কেবল বিশ্বাসের ধর্ম, এ-ধর্মে বুঝি যুক্তি-তর্কের স্থান নাই। কিন্তু এ প্রকার বিশ্বাস ভিত্তিবিহীন। গোতম শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার সময় ভূয়োভূয়ঃ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেন; যুক্তি-তর্কদ্বারা বুঝাইতেন যে, তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম উপকারী উপযোগী যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয়; এবং শিষ্যগণকে এই পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতেন।— ব্রহ্মজাল সুত্ত, ১।

কিন্তু এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যাহা তর্কগম্য নহে (অতক্কাবচার,

দীঘ, ১৷২৮ ; মজ্ঝ, ৭২ ; সংযুত্ত, ৬৷১ ; বিনয়, ১৷৫৷৩)। এ-সমুদায় সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষভাবে অনুভব করিবার বিষয়। নির্বাণ-ধর্মের অনেক তত্ত্বই এই প্রকার ; বুদ্ধ দিব্য আলোকে, দিব্য চক্ষুদ্বারা এই-সমুদায় সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, বুদ্ধ অনেক স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন।

খ. প্রাচীন পথ

বুদ্ধ যে-পথ দেখাইয়াছেন তাহা জগতের পক্ষে নূতন। কিন্তু গোতম বলিয়াছেন যে, ইহা পুরাতন পথ ; প্রাচীন কালের বুদ্ধগণ এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই প্রাচীন পথই নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এই উপমা দিয়াছেন—

"মনে কর, এক ব্যক্তি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরাতন মার্গ, প্রাচীন পথ দেখিতে পাইল। প্রাচীন কালে এই পথে মনুষ্যগণ যাতায়াত করিত। তখনই সেই ব্যক্তি সেই পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, এক পুরাতন নগর, এক পুরাতন রাজধানী রহিয়াছে ; প্রাচীন কালে বহু মানব এই স্থলে বাস করিত। এই নগর আরাম, উপবন ও পুষ্করিণী -সংযুক্ত এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তখন সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন রাজা এবং রাজমন্ত্রী সেই নগরকে উদ্ধার করিলেন এবং কালে সেই নগর বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিযুক্ত, বর্দ্ধিষ্ণু ও বিপুলতা-প্রাপ্ত হইল।"

এই দৃষ্টান্ত দিয়া গোতম বলিলেন—

"আমিও এই প্রকার এক পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীন কালের সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ এই পথে বিচরণ করিতেন।"— সংযুত্ত-নিকায়, ১২৷৬৫৷১৯-২১।

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—

"আমিও এই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি।" ১২।৬৫।২২।

গোতম এই পথকে প্রাচীন পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পথ নূতন। গোতম বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার পূর্বেও অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাবা নিশ্চয়ই এই পথ অনুসরণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

গ. কোন্ পথ

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই গোতম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে এই পথের বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে উপদেশ এই—

"হে ভিক্ষুগণ! পরিব্রাজকগণ দুই অন্ত পরিত্যাগ করিবে। সেই দুই অন্ত কি? প্রথম, হীন গ্রাম্য ইতর-জন-ভোগ্য অনার্য, অনর্থ-সংযুক্ত কাম্য বস্তুর উপভোগ। দ্বিতীয়, দুঃখময় অনার্য, অনর্থ-সংযুক্ত দেহ-নির্যাতন। এই দুই অন্ত অতিক্রম করিয়া তথাগত মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্বাণ লাভ করা যায়। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত যে মধ্যম পথ আবিষ্কাব করিয়াছেন, তাহা কোন্ পথ? ইহা এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—১. সম্যক্ দৃষ্টি, ২. সম্যক্ সঙ্কল্প, ৩. সম্যক বাক্, ৪. সম্যক্ কর্মান্ত, ৫. সম্যক্ আজীব, ৬. সম্যক্ ব্যায়াম, ৭. সম্যক্ স্মৃতি এবং ৮. সম্যক্ সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ! তথাগত এই মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন; এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্বাণ লাভ করা যায়।"—সংযুত্ত, ৫৬।১১।১-৪; বিনয়, মহাবগ্‌গ, ১।৬।১৭,১৮।

গোতমের ব্যাখ্যা

দীঘ-নিকায়ের অন্তর্গত মহাসতি পট্ঠান সুত্তন্তে এবং মজ্‌ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত সতি পট্ঠান সুত্তে মজ্‌ঝিম-নিকায়ের সচ্চবিভঙ্গ সুত্তে গোতম এই অষ্টাঙ্গ মার্গের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নিম্নে এই ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল—

১. সম্যক্ দৃষ্টি

দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি-প্রকারে হয়, দুঃখের নিরোধ কি, এবং কি-প্রকারে দুঃখের নিরোধ হয়— এই-সমুদায় জ্ঞানের নাম্ সম্যক্ দৃষ্টি।

২. সম্যক্ সংকল্প

নৈষ্কাম্য, অবিদ্বেষ এবং অহিংসা এই-সমুদায় বিষয়ে সঙ্কল্পের নাম সম্যক্ সংকল্প।

৩. সম্যক্ বাক্

অসত্য বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, অসার প্রলাপ-বাক্য এই-সমুদায় হইতে বিরত হওয়ার নাম সম্যক্ বাক্।

৪. সম্যক্ কর্মান্ত

প্রাণ বিনাশ না-করা, অদত্ত-বস্তু গ্রহণ না-করা, কাম-ভোগ হইতে বিরত থাকা— এই-সমুদায় সম্যক্ কর্মান্ত।

৫. সম্যক্ আজীব

অন্যায় উপায়ে জীবিকা উপার্জন না করিয়া ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা উপার্জনের নাম— সম্যক্ আজীব।

৬. সম্যক্ ব্যায়াম

'ব্যায়াম' অর্থে 'চেষ্টা' বা 'শ্রম'।—১. যাহাতে প্রাণে পাপ ও অকুশল ভাবের উদয় না হইতে পারে, ২. প্রাণে যে-সমুদায় পাপ ও

অকুশল ভাবের উদয় হইয়াছে, যাহাতে সেই-সমুদায় বিদূরিত হইতে পারে ; ৩. যে-সমুদায় কুশল ধর্ম প্রাণে উদিত হয় নাই, যাহাতে সেই-সমুদায় উদিত হইতে পারে , ৪. যে-সমুদায় কুশল ধর্মপ্রাণে উদিত হইয়াছে, যাহাতে সেই-সমুদায় স্থায়ী হইতে পারে, বৈপুল্য ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে— এই-সমুদায় বিষয়ে চেষ্টার নাম সম্যক্ ব্যায়াম।

৭. সম্যক্ স্মৃতি

সর্ববিষয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখার নামই সম্যক্ স্মৃতি। কোন্ কোন্ বিষয়ে স্মৃতি জাগ্রত রাখিতে হইবে, গোতম তাহা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে-যে বিষয়ে তিনি স্মৃতিমান্ হইতে বলিয়াছেন তাহা এই—

ক. দেহমূলক সমুদায় ঘটনা— যেমন, ভ্রমণ উপবেশন শয়ন অশন বাক্-উচ্চারণ ইত্যাদি।

খ. সুখ-দুঃখ-মূলক সমুদায় অবস্থা।

গ. চিত্ত-বিষয়ক সমুদায় অবস্থা— যেমন, রাগ দ্বেষ মোহ।

ঘ. (১) পঞ্চনীবরণ (কাম, ব্যাপাদস্ত্যানমিদ্ধ অর্থাৎ দেহ-মনের জাড্যদোষ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, অর্থাৎ উদ্ধত ভাব ও কুকর্ম-পরায়ণতা, এবং বিচিকিৎসা) ; (২) রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ ; (৩) চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন এই ছয়টি আযতন ; (৪) স্মৃতি, ধর্মানুসন্ধান বীর্য প্রীতি প্রশান্তভাব সমাধি উপেক্ষা এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং (৫) দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়।

এই-সমুদায় বিষয়ে সর্বদা স্মৃতিমান্ থাকাই সম্যক্ স্মৃতি।

৮. সম্যক সমাধি

চারিটি ধ্যানকে সম্যক্ সমাধি বলা হইয়াছে। গোতম যে-ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইতেন, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন।—

ক। প্রথম ধ্যান

গোতম বলিয়াছেন—

আমি কাম-ত্যাগ করিয়া অকুশল-ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিতর্কপূর্ণ বিচারপূর্ণ বিবেকজ (=নির্জনতা-মূলক, অসঙ্গ-জনিত) এবং প্রীতি-সুখপূর্ণ প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইতাম।

খ। দ্বিতীয় ধ্যান

তাহার পরে বিতর্ক ও বিচার অতিক্রম করিয়া, অধ্যাত্ম সম্প্রসাদ লাভ করিয়া, চিত্তের একাগ্রতা সংসাধন করিয়া, বিতর্কবিহীন, বিচারবিহীন সমাধিজ, প্রীতিসুখপূর্ণ দ্বিতীয় ধ্যানে বিহার করিতাম।

গ। তৃতীয় ধ্যান

তাহার পরে প্রীতির অতীত হইয়া, উপেক্ষা-ভাব লাভ করিয়া স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ হইয়া তৃতীয় ধ্যানে বিহার করিতাম। আর্যগণ এই অবস্থার বিষয়ে বলিয়া থাকেন—"যাঁহারা স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ তাঁহারা সুখ-বিহারী।"

ঘ। চতুর্থ ধ্যান

ইহার পরে সুখের অতীত হইয়া দুঃখের অতীত হইয়া (সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য) অতিক্রম করিয়া, দুঃখ-রহিত, সুখ-রহিত, এবং উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পবিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে বিহার করিতাম।— মজ্ঝিম, ভয়-ভেরব সুত্ত, দ্বেধা-বিতক্কসুত্ত, অঙ্গুত্তর-নিকায়, মহাবগ্গ, ৩।৬৩।৫ ইত্যাদি

এই চারিটি ধ্যানের নাম সম্যক্ সমাধি।

অনুকূল উপায়

সমাধি অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ সোপান। এই সোপানে অধিরোহণ করিতে হইলে প্রথম সাতটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। এই সাতটি উপায় সমাধির সহায়; অর্থ বুঝাইবার জন্য এ-সমুদায়কে 'সপ্ত-সমাধি-পরিক্খার' (সপ্ত-সমাধি-পরিষ্কার) বলা হইয়াছে।—দীঘ, ১৮।১২৭, মজ্‌ঝিম, ১১৭।

বহুস্থলে বলা হইয়াছে যে, ধ্যানে মগ্ন হইতে হইলে 'পঞ্চনীবরণ' বিদূরিত করিতে হয় (দীঘ, ২।৭৪, ২৫।১৭ ; মজ্‌ঝিম ৫১,৬০,৭৬ ইত্যাদি)। পঞ্চনীবরণাদি ক্ষীণ না হইলে ধ্যান সম্ভব হয় না, আবার ধ্যান সাধন না করিলেও এ-সমুদায় নির্মূল হয় না। প্রথমে হিংসা-বিদ্বেষাদি ক্ষীণ করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহার পরে ধ্যান-সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে এ-সমুদায় ক্ষীণতর হইবে এবং সর্বশেষে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

পথ ও লক্ষ্য

কেহ কেহ মনে করেন ধ্যানই যেন উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহা নহে, ধ্যান লক্ষ্য নহে; ধ্যান একটি পথ। ইহার লক্ষ্য "একান্ত নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধ, এবং নির্বাণ" (দীঘ, ২৯।২৪)। এই-সমুদায় লাভই ধ্যানের উদ্দেশ্য।

ধ্যান ও উদ্যমশীলতা

অনেকে মনে করেন, ধ্যানের সময়ে অন্তরে কোনোপ্রকার উদ্যম থাকে না। কিন্তু এ-বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ। বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, চতুর্থ ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হয়, পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয়, নির্দোষ ও নিষ্পাপ হয়, মৃদুতা (অর্থাৎ কোমলতা) প্রাপ্ত হয়, কর্মণ্য (কম্মনীয়) হয়, স্থির ও

অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।—দীঘ, ২।৮৩; মজ্‌ঝিম ৪; অঙ্গুত্তর, ৫।৭৫।১২, ৫।৭৬।১২ ইত্যাদি।

চিত্ত এ-সময়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না, কর্মণ্যই থাকে। চতুর্থ ধ্যানের পরও চিত্ত আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে।

অরূপ ধ্যান

বৌদ্ধ-গ্রন্থে সচরাচর চারিটি ধ্যানের কথা বলা হয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও পাঁচটি উচ্চতর অবস্থা আছে; এ-সমুদায়কেও কোনো-কোনো স্থলে ধ্যান বলা হইযাছে।—

পঞ্চম ধ্যান

প্রথম চারিটি ধ্যান রূপ-মূলক, কিন্তু শেষ চারিটি ধ্যান অরূপ ধ্যান।

পঞ্চম ধ্যানে সাধক রূপ-মূলক সমুদায় জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের সমুদায় বিষয়, এবং নানাত্ব বোধ— এ-সমুদায়ই অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে, 'আকাশ অনন্ত' এবং তখন সাধক আকাশের দিকে অনন্ত আযতনে বিহার করেন।

ষষ্ঠ ধ্যান

এই ধ্যানে সাধক 'আকাশের অনন্ত আয়তন' এ-জ্ঞানও অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয যে, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এবং তখন তিনি বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

সপ্তম ধ্যান

এই অবস্থায় সাধক 'বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন' এ-জ্ঞানও অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে, 'কিছুই নাই' এবং তখন তিনি আকিঞ্চন্যের (অর্থাৎ 'কিছুই নাই' ইহার) অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

অষ্টম ধ্যান

এই অবস্থায় সাধক 'আকিঞ্চন্যের অনন্ত আয়তন' এ-জ্ঞানও অতিক্রম করেন। তখন কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে, সংজ্ঞা (perception) এবং অসংজ্ঞা কিছুই নাই এবং তখন তিনি 'সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞা কিছুই নাই' ইহার অনন্ত আয়তনে বিহার করেন।

নবম ধ্যান

অষ্টম ধ্যানে যে আয়তনের কথা বলা হইল— তাহার বিষয়ে এই বলা যায় যে, "ইহা সংজ্ঞাও নয়— অসংজ্ঞাও নয়"। নবম ধ্যানে সাধক এ জ্ঞানও অতিক্রম করেন। তখন তিনি এমন অবস্থাতে বিহার করেন যে অবস্থাতে বেদনা (sensation) বা সংজ্ঞা (perception) কিছুই থাকে না। প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সাধকের বিষয়ে গোতম আরও বলিয়াছেন—

"তিনি নিশ্চিন্তভাবে গমন করেন, নিশ্চিন্তভাবে দণ্ডায়মান হন, নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন করেন এবং নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করেন।"

গোতম আলাড় কালামের নিকট সপ্তম ধ্যান এবং রামপুত্র উদ্দকের নিকট অষ্টম ধ্যান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নবম ধ্যান কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই, নিজেই সাধন-বলে এই অবস্থায় প্রবেশ করিতেন। —মজ্‌ঝিম-নিকায়, অরিয়-পরিয়েসন-সুত্ত।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা

মিত্রের প্রতি যে ভাব সেই ভাবের নাম মৈত্রী; বতমান যুগে আমরা প্রেম ভালোবাসা (love), ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রাণের যে অবস্থায় অপরের দুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়, অপরের দুঃখ ও অহিত দূর করিবার বাসনা হয়, সেই অবস্থার নাম করুণা।

প্রাণের যে অবস্থায় অপরের সুখে সুখ উপস্থিত হয়, সেই অবস্থার নাম মুদিতা। এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন মানুষ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হয় এবং নিত্যই শান্তভাবে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থাকে উপেক্ষা বলা হয়।

মৈত্রী-ভাবনা, করুণা-ভাবনা, মুদিতা-ভাবনা ও উপেক্ষা-ভাবনা—বৌদ্ধধর্মের এক বিশেষ সাধনা। বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু স্থলে এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

গোতম নিজেও এই প্রকার সাধন করিতেন। এক স্থলে এইপ্রকার বলিয়াছেন—

"আমি তৃণপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাব উপবে যোগাসনে উপবেশন করিতাম এবং দেহকে ঋজুভাবে স্থাপন করিয়া মনকে স্থির করিতাম।· · তাহার পব মৈত্রীপরিপূর্ণ চিত্তদ্বারা জগতের একদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম; এইরূপ দ্বিতীয় দিক্, তৃতীয় দিক্ ও চতুর্থ দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম। উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক্, এবং সর্বত্র, সর্বস্থানে, সর্বলোকে, আমি বিপুল, মহত্বপ্রাপ্ত, অপরিমেয়, অবৈর ও হিংসাবিহীন এবং মৈত্রীপরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম।"— অঙ্গুত্তর-নিকায়, মহাবগ্‌গ, ৩।৬৩।৬।

ইহার পরে ঠিক এই ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বোক্তপ্রকারে করুণা, মুদিতা ও মৈত্রী দ্বারা সর্বজগত ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতেন।

এ বিষয়ে তিনি রাহুলকে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন—

"হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী-ভাবনায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি ('ব্যাপাদ') বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! করুণা-ভাবনা সাধন করিবে; করুণা-ভাবনা দ্বারা হিংসা-বুদ্ধি বিদূরিত হইবে। হে রাহুল! মুদিতা-ভাবনা সাধন করিবে, মুদিতা-ভাবনা দ্বারা 'অ-রতি'-ভাব বিদূরিত

হইবে। হে রাহুল! উপেক্ষা-ভাবনা সাধন করিবে, উপেক্ষা-ভাবনা দ্বারা 'রাগ' (অর্থাৎ আসক্তি, কাম) বিনষ্ট হইবে।" —মজ্‌ঝিম, ৬২, মহারাহুলোবাদ সুত্ত।

মৈত্র্যাদি-ভাবনা দ্বারা যে বিদ্বেষাদি ভাব অপগত হয় তাহা অন্যান্য স্থলেও বর্ণিত হইয়াছে।— দীঘ-নিকায়, সঙ্গীতি সুত্তন্ত, ২।২।১৭।

সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার

সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার উভয়ই সাধনের পথ। কিন্তু প্রণালীতে পার্থক্য আছে। মজ্‌ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত মহা-বেদল্ল সুত্তে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্যক্ সমাধিতে চিত্তের যে বিমুক্তি হয়, তাহার নাম অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি, আকিঞ্চন্য চিত্ত-বিমুক্তি এবং শূন্যতা চিত্ত-বিমুক্তি। সমাধির উচ্চ অবস্থায় কোনো বাহ্যবস্তু চিন্তার বিষয় হয় না, এই জন্য ইহা অনিমিত্ত (নিমিত্তবিহীন)। তখন অন্তরে এই চিন্তা উপস্থিত হয় 'কিছু নাই' 'কিছু নাই', এই জন্য ইহার নাম আকিঞ্চন্য (কিছু নাই— এই ভাব)। তখন আমিত্ব-জ্ঞান ও মমত্ব-বোধ বিদূরিত হয়, এইজন্য ইহার নাম শূন্যতা। কিন্তু ব্রহ্মবিহারে চিত্তের যে বিমুক্তি, তাহাতে চিত্তের প্রসারতা বর্ধিত হয়, তাহা অসীম, ও অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ বা পরিমাণরহিত। এইজন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি।

প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও এতদুভয়েরই লক্ষ্য ও ফল একই। সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার উভয় সাধনেই রাগ দ্বেষ মোহ বিদূরিত হয়, উভয়ই অর্হত্বপ্রাপ্তির ও নির্বাণলাভের উপায়।—মজ্‌ঝিম, ৪৩, মহাবেদল্ল সুত্ত।

উভয় পথই ধ্যানের পথ, উভয়ই গোতমের অনুমোদিত এবং উভয় পথেই গোতম সাধনা করিয়াছিলেন। এই সাধনার ফল বুদ্ধত্ব লাভ।

নির্বাণতত্ত্ব

আত্মতত্ত্বের সহিত নির্বাণতত্ত্বের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আত্মতত্ত্ব না জানিলে নির্বাণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় না। এইজন্য আলোচনার প্রারম্ভেই বুদ্ধের আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক মৌলিক কথাটি স্মরণ করা আবশ্যক।

গোতমের আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহা (আমাদের ভাষায়) আত্মবাদই। তিনি ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা— এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। আত্মার ব্যাবহারিক সত্তা কি? না, এই পার্থিব জীবন, রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ-মূলক এই জীবন, দেহ বেদনা সংজ্ঞাদি দ্বারা গঠিত, রাগ দ্বেষ মোহ-ময় তৃষ্ণাকুল এবং অশ্রু পরিপূর্ণ এই জীবন। বেদান্তের ভাষায় উপাধিমূলক জীবনই আত্মার ব্যাবহারিক অবস্থা। পারমার্থিক অবস্থা কি? না, দেশকালের অতীত, দেহবেদনা-সংজ্ঞাদি পঞ্চস্কন্ধের অতীত অবস্থাই আত্মার পারমার্থিক রূপ। বেদান্তের ভাষায় নিরুপাধি অবস্থাই আত্মার পারমার্থিক রূপ।

নির্বাণ কি

এখন সহজেই বলা যাইতে পারে নির্বাণ কি। নির্বাণ অর্থ— সংসার-অবস্থার নির্বাণ, ব্যাবহারিক সত্তার নির্বাণ, উপাধির নির্বাণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, উপাধির নির্বাণ এবং নিরুপাধি অবস্থা লাভ একই কথা। একের আত্যন্তিক নির্বাণ হইলেই অপরের স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্যাবহারিক সত্তার বিনাশ যাহা, পারমার্থিক সত্তার প্রকাশও তাহাই। সুতরাং নির্বাণের দুই দিক: এক, বিনাশের দিক, অপর, প্রকাশের দিক। ব্যাবহারিক সত্তাকে বিনষ্ট করিয়া যে পারমার্থিক রূপকে উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহা নহে। পারমার্থিক রূপের উৎপত্তি নাই। ব্যাবহারিক

সত্তাকে নির্মূল কর ; তখন একমাত্র পারমার্থিক সত্তাই প্রকাশিত থাকিবে। ইহাই নিত্যাবস্থা, ইহাই পরমাবস্থা, ইহাকে নির্বাণ বলা হইয়াছে।

নির্বাণের উপমা

বুদ্ধ অনেক সময়ে উপমা দ্বারা নির্বাণতত্ত্ব বুঝাইতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই—

ক ॥ সুত্তনিপাতে (২৩৫) বলা হইয়াছে—

"নিব্বন্তি ধীরা যথায়াং পদীপঃ"

অর্থাৎ এই প্রদীপ যেমন (নির্বাপিত হয়, তেমনি), ধীরগণ নির্বাপিত হয়েন।

খ ॥ কয়েকটি স্থলে বিমুক্ত পুরুষের মৃত্যুবিষয়ে এইরূপ উপমা দেওয়া হইয়াছে—

"পজ্জোতস্স এব নিব্বানং।"—দীঘ-নিকায়, ২।১৫৭ পৃঃ (মহাপরিনিঃ ৬।১০) ; সংযুতনিঃ ১।১৫৯ ; অঙ্গুত্তর ৪।৩ পৃঃ।

মুক্ত পুরুষের মৃত্যু কি প্রকার ? না, "যেমন প্রদীপের নির্বাণ।"

এই দৃষ্টান্তে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই—

নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের ব্যাবহারিক সত্তা প্রদীপনির্বাণের ন্যায় নির্বাপিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাবহারিক রূপের বিনাশ এবং পারমার্থিক সত্তার প্রকাশ একই কথা। পারমার্থিক সত্তার প্রকাশের জন্যই ব্যাবহারিক রূপের আত্যন্তিক বিনাশ।

গ ॥ নির্বাণকে সাগরের সহিতও তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

বচ্ছগোত্ত নামক একজন পরিব্রাজক বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে এই-প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল—

"যেমন গঙ্গানদী সমুদ্রাভিমুখে নত হইয়া, সমুদ্রপ্রবণ হইয়া, সমুদ্রে সংগৃহীত হইয়া, সমুদ্রপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনি গৃহপতি-পরিব্রাজক-

সহ গোতমের সমুদায় পরিষদ্ নির্বাণাভিমুখে নত হইয়া (নিব্বান-নিন্ন), নির্বাণ-প্রবণ হইয়া (নিব্বান-পোণা), নির্বাণে সংগৃহীত হইয়া (নিব্বান-পবভারা), নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।"— মজ্ঝিম, ১।৪৯৩।

নিব্বান-নিন্ন, নিব্বান-পোণ, নিব্বান-পব ভার এই কয়েকটি কথা বৌদ্ধ সাহিত্যে বহুল প্রচলিত।

মুক্তিবিষয়ে উপনিষদের ভাষা এই—

"যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তগমন করে, তেমনি বিদ্বান্ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষে প্রবেশ করে।"— মুণ্ডক, ৩।২।৫।

অন্যত্র আছে—

"যেমন এই-সমুদায় প্রবহমান ও সমুদ্রাভিমুখী নদীসমূহ সমুদ্রপ্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্তগমন করে, এবং তখন তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং তখন তাহাদিগকে সমুদ্রই বলা হয়— সেইরূপ পুরুষাভিমুখে গমনশীল পরিদ্রষ্টা (জীবাত্মার) যে ষোড়শ কলা সে-সমুদায় সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্তগমন করে, তখন তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং তখন তাহাদিগকে পুরুষই বলা হয়।"— প্রশ্ন, ৬।৫।

মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায় তখন তাহার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার পৃথক অস্তিত্বই থাকে না।

বৌদ্ধধর্মেও মুক্তপুরুষের বিষয়ে ঠিক ঐ কথাই বলা হইয়াছে। গোতম বচ্ছগোত্ত নামক পরিব্রাজককে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"হে বচ্ছ! যে রূপ, যে বেদনা, যে সংজ্ঞা, যে সংস্কার, যে বিজ্ঞান দ্বারা তথাগতের (অর্থাৎ মুক্তপুরুষের) অস্তিত্ব বর্ণনা করা যাইতে পারে তথাগতের সেই রূপ সেই বেদনা ·সেই সংজ্ঞা· ·সেই সংস্কার· ·সেই বিজ্ঞান অপনীত হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত

হইয়াছে, অসদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়াছে। তথাগত রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান হইতে বিমুক্ত এবং মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর অপ্রমেয় ও দুরবগাহ।"— মজ্ঝিম, ১।৪৮৭-৪৮৮, সংযুত্ত, ৪।৩৭৬-৩৭৭।

মুক্তপুরুষের স্বরূপ বিষয়ে গোতম-মতের সহিত উপনিষদের মতের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় মতেই মুক্তপুরুষ নাম-রূপ-বিহীন।

গোতম ও তাঁহার শিষ্যগণ নানাভাবে নির্বাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১. ভবনিরোধ

বহুস্থলে বলা হইয়াছে—

"ভবনিরোধো নিব্বানং।"

অর্থাৎ ভবনিরোধই নিবাণ।— সংযুত্ত ২।১১৭, দুইবার; অঙ্গুত্তর ৫।৯, ১০ পাঁচ বার ইত্যাদি।

ভব = জন্ম, উৎপত্তি। 'ভবনিরোধ' অর্থ 'জন্মনিবৃত্তি।' এ স্থলে বলা হইল পুনর্জন্মের অতীত হওয়াই নির্বাণ।

২. সর্ব-গ্রন্থি-প্রমোচন

সংযুত্ত-নিকায় গ্রন্থে (১।২১০) বলা হইয়াছে—

"নিব্বানং ভগবা আহু সব্ব-গন্থ-প্পমোচনং।"

অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই নির্বাণ।

ইতিবুত্তক (১০২) ও থেরগাথাতেও (১১৬৫) এই কথাই বলা হইয়াছে।

৩. তৃষ্ণাক্ষয়

ক ॥ যতক্ষণ বাসনা আসক্তি তৃষ্ণা ততক্ষণই সংসারবন্ধন। তৃষ্ণাদি অতিক্রম করিতে না পারিলে ভব-বন্ধন ছিন্ন হয় না। এইজন্য বহু স্থলে 'তৃষ্ণাক্ষয়'কে নির্বাণ বলা হইয়াছে।

"তণ্‌হায় বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি"

অর্থাৎ "তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ, এইরূপ বলা হয়।"— সুত্তনি ১১০৯; সংযুত্ত ১।৩৯।

খ ॥ সংযুত্ত-নিকায়ের অন্য এক স্থলে (৩।১৯০) বলা হইয়াছে— 'তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্বাণ'।

"তণ্‌হা কখয়োহি· ·নিব্বানং"।

গ ॥ ঐ গ্রন্থেরই অপর এক স্থলে (৪।৩৭১) তৃষ্ণাক্ষয় ও নির্বাণকে একার্থ-সূচকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪. "ছন্দ-রাগ-বিনোদন"

সুত্তনিপাতে (১০৮৬) বলা হইয়াছে—

"ছন্দ-রাগ-বিনোদনং
নিব্বানং পদমচ্চুতং"

অর্থাৎ বাসনা ও আসক্তির বিনাশই অচ্যুতনির্বাণ পদ।

৫. রাগ-ক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়

ক ॥ এক সময়ে জম্বুখাদক নামক পরিব্রাজক সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"হে সারিপুত্র! 'নির্বাণ, নির্বাণ' এই প্রকার বলা হয়। কিন্তু নির্বাণ কি?"

ইহার উত্তরে সারিপুত্র বলিয়াছিলেন—

"হে আবুষ! 'রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয়, এবং মোহ-ক্ষয়'— ইহাকেই নির্বাণ বলা হয়"।— সংযুক্ত, ৪।২৫১।

বঙ্গভাষায় 'রাগ' অর্থ ক্রোধ। কিন্তু সংস্কৃত ও পালি ভাষায় ইহার অর্থ 'আসক্তি' 'কামনা' ইত্যাদি।

খ॥ অন্য এক সময়ে সামন্তক নামক একজন পরিব্রাজকও সারিপুত্রকে ঐ প্রশ্নই করিয়াছিলেন এবং সারিপুত্র তাঁহাকে ঐ উত্তরই দিয়াছিলেন। —সংযুক্ত, ৪।২৬১।

গ॥ অন্য এক স্থলে (সংযুক্ত ৪।৩৭১) লিখিত আছে যে, স্বয়ং গোতমও ঐ প্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিও বলিয়াছিলেন যে—

"রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়ই নির্বাণ"

৬. বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ

ক॥ বহুস্থলে নির্বাণকে একসঙ্গে এই পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে[১]—

১ সমুদায় সংস্কারের উপশম।
২ সর্বপ্রকার উৎপত্তির যে উপাদানসমূহ, সেই-সমুদায় উপাদানের বিনাশ।
৩ তৃষ্ণাক্ষয়
৪ বিরাগ
৫ নিরোধ

১ অঙ্গুত্তর ১।১৩৩; ২।১১৮; ৩।১৬৪; ৪।৪২৩; ৪।৪২৪; ৫।১১০, ১১১, ৩২০, ৩২২, ৩১৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮; সংযুক্ত ১।১৩৬; ৩।১৩৩; ৫।২২৬; মজ্‌ঝিম ১।১৩৬; ১৬৭, ৪৩৬ ইত্যাদি।

খ ॥ ইতিবুত্তক (৯০) এবং অঙ্গুত্তর-নিকায়ে (২।৩৪ পৃঃ) ঐ কথাই কিছু পরিবর্তিত ভাষায় বলা হইয়াছে। উভয় গ্রন্থেই বুদ্ধের উক্তি এই—

"হে ভিক্ষুগণ! 'সংস্কৃত' বা 'অসংস্কৃত' যে সমুদায় ধর্ম আছে, তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল বিরাগ, ইহা এই (সমুদায় নামেও অভিহিত)— মদ-নির্মদন, পিপাসা-বিলয়, আসক্তির উচ্ছেদ, সংসারাবর্তনের উপচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।"

শেষ অংশের অর্থান্তরও হইতে পারে। তৃষ্ণাক্ষয়ের পরে ছেদ। ইহার পরবর্তী অংশের অর্থ—"বিরাগই নিরোধ ও নির্বাণ।"

আমরা অনুবাদে 'সংস্কৃত' এবং 'অসংস্কৃত' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। মূলে আছে সংখতা (সংস্কৃত) এবং অসংখতা (অসংস্কৃত)। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে যাহার উৎপত্তি তাহাই 'সংখত'; এবং যাহার উৎপত্তি হয় না তাহা 'অসংখত'।

৭. পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ

খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পটিসম্ভিদা নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—

"পঞ্চন্নং খন্ধানং নিরোধো নিব্বানং"

অর্থাৎ 'পঞ্চস্কন্ধের নিরোধই নির্বাণ' এই অংশ চল্লিশ বার উক্ত হইয়াছে (পৃঃ ২৩৮-২৪১)।

পঞ্চস্কন্ধ এই—

রূপ (=দেহ), বেদনা (ইন্দ্রিয়ের উপরাগ, sensation), সংজ্ঞা, সংস্কার, এবং বিজ্ঞান। এই পাঁচটি লইয়াই মানবের ব্যাবহারিক অবস্থা। যখন এই পঞ্চস্কন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, যখন ইহার আর পুনরুৎপত্তি সম্ভব হয় না— তখনই নির্বাণলাভ।

এই-সমুদায় অংশে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চস্কন্ধ-নিরোধ, ভব-নিরোধ, তৃষ্ণাক্ষয়, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, বিরাগ এবং নির্বাণ একই।

৮. নির্বাণের প্রতিশব্দ

আমরা সাধারণতঃ যে-স্থলে নির্বাণ শব্দ ব্যবহার করি, সংযুক্ত-নিকায় গ্রন্থে (৪।৩৬২-৩৭৩) সে-স্থলে তেত্রিশটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই তেত্রিশটি এই—

(১) অসংখত (অসৃষ্ট, অনির্মিত), (২) অন্ত (লক্ষ্য), (৩) অনাসব (অনাস্রব = রাগদ্বেষাদিরহিত), (৪) সত্যং, (৫) পার, (৬) নিপুণ, (৭) সুদুর্দর্শ, (৮) অ-জর্জর (= অজর), (৯) ধ্রুব, (১০) অপলোকিত (= অক্ষয়), (১১) অ-নিদর্শন (লক্ষণরহিত), (১২) নিষ্প্রপঞ্চ (প্রপঞ্চবিহীন), (১৩) শান্তং, (১৪) অমৃতং, (১৫) পনীত (= প্রণীত = উত্তম), (১৬) শিবং, (১৭) ক্ষেম, (১৮) তৃষ্ণাক্ষয়, (১৯) আশ্চর্য, (২০) অদ্ভুত, (২১) অনীতিক (= অন্ + ঈতি—ক = নিরাপদ), (২২) অনীতিকধর্মা, (২৩) নিবাণ, (২৪) অব্যাপজ্ঝ (দুঃখরহিত), (২৫) বিরাগ (২৬) শুদ্ধি, (২৭) মুক্তি, (২৮) অনালয় (আশ্রয় বিহীন), (২৯) দীপ, (৩০) লয়ন (আশ্রয়), (৩১) ত্রাণ, (৩২) শরণ, এবং (৩৩) পরায়ণ (পরমা গতি)।

এই তেত্রিশটিই সমপর্যায়ের কথা। প্রত্যেকটিরই অর্থ 'রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়'। এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন স্বয়ং গৌতম (৪।৩৬২-৩৭৩)।

৯. আটচল্লিশটি বিশেষণ

পটিসম্ভিদা গ্রন্থের এক অংশেই নির্বাণের চল্লিশটি বিশেষণ পাওয়া যায়। সেই চল্লিশটি এই—

(১) নিত্য, (২) সুখ, (৩) আরোগ্য, (৪) অ-গণ্ড (=অব্রণ), (৫) নিঃশল্য (রাগ-দ্বেষাদি শল্যবিহীন), (৬) অনঘ (দুঃখবিহীন), (৭) অনাবাধ (ব্যাধিবিহীন), (৮) অ-পর প্রত্যয় যাহা অপরের উপর নির্ভর করে না, (৯) অপলোকধর্ম (আয়রহিত), (১০) অনাতিক (নিরাপদ), (১১) অনুপদ্রব, (১২) অভয়, (১৩) অনুপসর্গ (উপসর্গবিহীন), (১৪) অচল, (১৫) অ-প্রভঙ্গ (যাহা ভঙ্গপ্রবণ নহে), (১৬) ধ্রুব, (১৭) ত্রাণ, (১৮) লয়ন (=আশ্রয়), (১৯) শরণ, (২০) অ-রিক্ত (যাহা রিক্ত নহে অর্থাৎ শূন্য নহে), (২১) অ-তুচ্ছ, (২২) মহাশূন্য (যাহাতে দেশকালমূলক বা পঞ্চস্কন্ধমূলক কিছু নাই), (২৩) পরমার্থ, (২৪) অনাদীনব (অন্+আদীনব, দৈন্যরহিত, দুর্গতিরহিত), (২৫) অবিপরিণামধর্মা (বিকাররহিত), (২৬) সার, (২৭) অনঘ-মূল (যাহার মূলে দুঃখ নাই), (২৮) অ বধক (যে বিনাশক নহে), (২৯) অ-বিভব (যাহাতে মৃত্যু নাই; ভব=জন্ম, বি-ভব=মৃত্যু), (৩০) অনাস্রব (আস্রববিহীন, কামাদিরহিত), (৩১) অসংখত (যাহা যৌগিক বস্তু নহে অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন নহে), (৩২) নিরামিশ (=কামনাবিহীন), (৩৩) অজাত, (৩৪) অজর, (৩৫) অব্যাধি, (৩৬) অমৃত, (৩৭) অশোক, (৩৮) অপরিদেব (বিলাপরহিত), (৩৯) অনুপায়াস (আয়াসবিহীন, দুঃখবিহীন), (৪০) অসংক্লিষ্ট (ক্লেশবিহীন, দোষবিহীন),— পটিসম্ভিদা পৃঃ ২৩৮–২৪১।

ঐ গ্রন্থেরই অপরাপর স্থলে এই কয়েকটি অতিরিক্ত বিশেষণ পাওয়া যায়— (৪১) অনুৎপাদ (উৎপত্তি-বিহীন), (৪২) অ-প্রবর্ত (সংসার-

গতির অতীত), (৪৩) অনায়ূহনা (শ্রমবিহীন), (৪৪) অ-প্রতিসন্ধ (জন্মরহিত), (৪৫) অগতি (গতিরহিত), (৪৬) অনির্বৃত্তি (আবর্তনবিহীন), (৪৭) অনুৎপত্তি (উৎপত্তি-বিহীন), (৪৮) নিরোধ (সর্বপ্রকার উৎপত্তির নিরোধ)।— পৃ ১৪-১৫ ; ৬৭

১০. স্বরূপ বিশ্লেষণ

১. সত্যং॥ নির্বাণকে সত্যং বলা হইয়াছে (সং।৪)। উপনিষদের ব্রহ্ম ও সত্যং। —তৈত্তি ২।১।১, ছাঃ ৮।৪, বৃহঃ ২।১।২০ ইত্যাদি।

নির্বাণ নিরপেক্ষ সত্তা, ইহার কোনো আশ্রয় নাই বা আশ্রয় আবশ্যক হয় না, এই জন্য বলা হইয়াছে ইহা 'অনালয়' অর্থাৎ আলয়বিহীন (আশ্রয়-বিহীন)। —সং।২৮।

এই নির্বাণ-সার (পা।২৬) এবং পরমার্থ (পা।২৩)।

২. অজাত, অভূত, অকৃত॥ নির্বাণের উৎপত্তি বা সৃষ্টি নাই। ইহা বুঝাইবার জন্য অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন অসংখত (সং ১ পা।৩১) অপ্রবর্ত (৪।৪২), অনুৎপাদ (পা।৪১), অনুৎপত্তি (পা।৪৭), অগতি (পা।৪৫), অনিবৃত্তি (পা।৪৬), অজাত (পা।৩৩), অভূত অকৃত ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'অজাত' 'অভূত' 'অকৃত' এবং 'অসংখত' এই কয়েকটি কথা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উদান (৮) এবং ইতিবুত্তক (৪৩) নামক গ্রন্থে এই চারিটি এক সঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ইহা স্বয়ং বুদ্ধের উক্তি।

ধম্মপদ গ্রন্থে নির্বাণকে 'অকৃত' এবং নির্বাণ-জ্ঞকে 'অকৃত-জ্ঞ' বলা হইয়াছে। —শ্লোক ৯৭, ৩৮৩।

মজ্ঝিম-নিকায় গ্রন্থেও (১।১৬৭) নির্বাণকে 'অজাত' বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ব্রহ্মও অজাত, অভূত, অকৃত।

৩. নিত্য, ধ্রুব, অচ্যুত, অচল ॥ নির্বাণ নিত্য (প।১), ধ্রুব (প।১৬), অচ্যুত ও অচল (প।১৪)। এ-সমুদায় ব্রহ্মেরও স্বরূপ।

সুত্তনিপাতে (২০৪, ১০৮৬) বলা হইয়াছে—

"নিব্বানপদং অচ্চুতং"

অর্থাৎ নির্বাণপদ অচ্যুত।

থেরা গাথার ভাষা— নিব্বানং পদমচ্চুতং (৯১), অর্থাৎ নির্বাণ অচ্যুত পদ।

কোনো কোনো স্থলে নির্বাণ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ঐ অর্থে 'অচ্যুতস্থান' (অচ্চুতংঠানং, ধম্মপদ ২২৫) এবং 'অচ্যুতপদ' (অচ্চুতং পদং সংযুত্ত, ৩।১৪৩) ব্যবহার করা হইয়াছে।

বিমানবত্থু নামক গ্রন্থে (৫১) নির্বাণকে 'অচল স্থান' (অচলট্ঠ ঠানং) বলা হইয়াছে।

এই নির্বাণ অ-পলোকিত (সং।১০)? অর্থাৎ অক্ষয় এবং অ-পলোকধর্মা (প।৯)।

৪. অমৃত ॥ নির্বাণ অমৃতং (সং।১৪, প।৩৬, মজ্ঝিম ১।১৬৭) সুত্তনিপাতে বলা হইয়াছে—

"অমতং· ·নিব্বানপদং" (২০৪) অর্থাৎ নির্বাণপদ অমৃত।

সংযুত্ত-নিকায়ের এক স্থলে (৫।৮পৃঃ) রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়কে অমৃতং বলা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্বাণকে 'অমৃতং' বলা হইল।

বহুস্থলে নির্বাণ শব্দ উল্লেখ না করিয়া ঐ অর্থে অমৃত ও অমৃতপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। (ধম্মপদ, শ্লোক ১১৪, ৩৭৪; সংযুত্ত ১।২১২; ২।২৮০ পৃঃ; অঙ্গুত্তর ১।৪৫-৪৬ চব্বিশ বার; ইত্যাদি)।

থেরী গাথাতে নির্বাণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

"ইদং অজরং, ইদং অমরং, ইদং অজরামরণ পদং অশোকং"

(৫১২) অর্থাৎ ইহা অজর, ইহা অমর, ইহা অজরামরণ পদ এবং অশোক।

এই নির্বাণ অবিভব (পা।২৯) অর্থাৎ মৃত্যুবিহীন।

উপনিষদের ব্রহ্মও অমৃতং।—মুণ্ডক ২।২।৭, ১১, ছাঃ ৪।১৫।১, অষ্টম অধ্যায়ে বহুবার, ইত্যাদি।

৫. অভয়ং॥ নির্বাণ অভয়ং (পা।১২) ইহাকে 'অকুতো ভয়ং'ও বলা হইয়াছে (ইতিবুত্তক ১১১, অঙ্গুত্তর ২।২৪ পৃঃ, সংযুক্ত ১।১৯২ ইত্যাদি)

ব্রহ্মও 'অভয়ং'।—ছাঃ ৪।১৫।১, ৮ম অধ্যায় বহুবার, বৃহঃ চতুর্থ অধ্যায় বহুবার, ইত্যাদি।

৬. শান্তং॥ নির্বাণশান্তং (সং।১৩)। সুত্তনিপাতে (৯৩৩) নির্বাণকে 'শান্তি' বলা লইয়াছে। এই নির্বাণ শান্তিপদ (অঙ্গুত্তর ২।১৮ পৃঃ, সুত্তনিপাত ২০৮, ৯১১, ১০৯৬, ইত্যাদি) নির্বাণ পথকে বহুস্থলে 'শান্তিবর পদ' (মজ্-১।১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ২।২৩৭, ২৩৮) এবং শান্তি মার্গ (ধম্মপদ ২৮৫) বলা হইয়াছে।

বহুস্থলে নির্বাণকে 'যোগক্ষেম' বলা হইয়াছে। (মজ্ ১।১৬৩, ১৬৭, ৪৭৭ ইত্যাদি, অঙ্গু ২।২৪৭, ২৪৮, সংযুক্ত ২।১৯৫ ইত্যাদি) বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'যোগক্ষেম' শব্দ 'পরমা শান্তি' 'অচল প্রতিষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উপনিষদের ব্রহ্মও 'শান্তং' (মাণ্ডুক্য ৭)।

৭. শিবং॥ নির্বাণকে শিবং বলা হইয়াছে (সং।১৬)। সম্বুদ্ধ অবস্থাও শিবং। —সুত্তনিপাত, ৪০৮।

উপনিষদের ব্রহ্মও শিবং।—মাণ্ডুক্য ৭, শ্বেত ৩।১১, ৪।১৪, ১৬, ১৮, ৫।১৪।

৮. পরমং সুখম্ ॥ নির্বাণকে সুখং বলা হইয়াছে (প। ২; অঙ্গুত্তর ৪।৪১৪ ইত্যাদি) মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থের একই অধ্যায়ে ছয় বার (১।৫০৮-৫১০) এবং ধম্মপদের একই অধ্যায়ে দুইবার (২০৩, ২০৪) শ্লোক উক্ত হইয়াছে যে—

"নিব্বানং পরমং সুখং", অর্থাৎ নির্বাণ পরম সুখ।

উপনিষদের ব্রহ্মও সুখং (ছান্দোগ্য ৭।২৩) এবং আনন্দং। —বৃহঃ ৩।৯।২৮, মুণ্ডক ২।২৭ ইত্যাদি।

৯. ত্রাণ, শরণ, পরায়ণ ॥ নির্বাণই লক্ষ্য, পরমাগতি এবং আশ্রয়-স্থল। ইহা বুঝাইবার জন্য 'অন্ত' (সং।০), লয়ন (সং।৩০, প।১৮), ত্রাণ (সং ৩১, প।১৭), শরণ (সং।৩২; প।১৯) এবং পরায়ণ (সং।৩৩) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এ-সমুদায়ই উপনিষদের ভাব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ব্রহ্ম 'সর্ব্বস্য শরণং' (৩।১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে একই অধ্যায়ে ব্রহ্মকে ১৭ বার 'সকলের পরায়ণ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৩৯।১০-২৮)। অন্যত্র ব্রহ্মকে 'পরমাগতি' (বৃঃ ৪।৩।৩২) বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে পরমাত্মা "পরাগতি" (৩।১১)।

১০. দীপ ॥ বৌদ্ধগ্রন্থে বহু স্থলে নির্বাণকে দীপ বলা হইয়াছে। —সং।২৯; সুত্ত নিঃ ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪। দীপ শব্দের দুই অর্থ: (১) প্রদীপ, জ্যোতি; (২) দ্বীপ।

(ক) জ্যোতিঃ

উপনিষদের ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ (ছাঃ ৩।১৩।৭, ৩।১৭।৭; বৃহ ৪।১৪।১৬; কঠ ২।১৩; শ্বেত ৩।১২; মুণ্ডক ২।২।৯ ইত্যাদি)। এ জ্যোতিঃ অবশ্যই জড় জগতের জ্যোতিঃ নহে— ইহা অধ্যাত্ম-জ্যোতিঃ।

(খ) দ্বীপ

'দ্বীপ' অর্থেও 'দীপ' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সংসারকে সাগরের সহিত তুলনা করা হয়। নক্র-কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ ভীষণ সংসার-সমুদ্র মধ্যে নির্বাণ দ্বীপ স্বরূপ। এই দ্বীপ অর্থ নিরাপদ আশ্রয়ভূমি। ত্রাণ, লয়ন, শরণ, দ্বীপ একার্থসূচক। এই অর্থে উপনিষদের ব্রহ্ম ও দ্বীপ (৯ম অংশ "ত্রাণ, শরণ, পরায়ণ" দ্রষ্টব্য)।

১১. পার॥ বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্বাণকে 'পার' অর্থাৎ অপর তীর বলা হইয়াছে (সং৫ ; সংযুক্ত ১।২২৬ পৃঃ ; ধম্মপদ, ৮৫, ৮৬, শ্লোক)। বহু স্থলে 'পারিমং তীরং' (অর্থাৎ 'ওপার') ব্যবহৃত হইয়াছে (অঙ্গু ৫।২৩২, ২৩৩, ২৫২, ২৫৩ ; সংযুক্ত ৪।১৭৪, ১৭৫, ইত্যাদি)। অঙ্গুত্তরের মতে 'সম্যক্ বিমুক্তি' এবং এই সংক্রান্ত যাহা-কিছু তাহাই 'পারিমং তীরং'। সংযুক্ত-নিকায়ে 'পার' নির্বাণের প্রতিশব্দ।

উপনিষদের ব্রহ্মও 'ও পারে'— অন্ধকারের পরপারে (তমসঃ পরস্তাৎ —শ্বেতঃ ৩।৮, মৈত্রী ৬।২৪)।

বলা বাহুল্য গোতম এবং উপনিষৎ উভয়েব মতেই এই সংসার তমসাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারের পরপারে গমনই মুক্তি।

১২. শুদ্ধমপাপবিদ্ধং॥ ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ (ঈশ ৮)। নির্বাণের প্রকৃতিও এই প্রকার। ইহা বর্ণনা করিবার জন্য যে এই দুইটি শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু এই অর্থ প্রকাশক অনেক শব্দ দ্বারা নির্বাণকে বর্ণনা করা হইয়াছে। নির্বাণকে বলা হইয়াছে শুদ্ধি (সং।২৬)।

ধম্মপদ গ্রন্থের মগ্‌গ বগ্‌গ প্রকরণে এইরূপ আছে "এসো ব মগ্‌গো, নৎথঞ্‌ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিয়া" (২৭৪)। ইহার একাধিক অর্থ করা হইয়াছে। একটি অর্থ এই—"ইহাই মার্গ, বিশুদ্ধি দর্শনের জন্য অর্থাৎ নির্বাণ দর্শনের জন্য অন্য (পথ) নাই।" ঐ প্রকরণেই তিন বার বলা

হইয়াছে (২৭৭-২৭৯) —"এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া" অর্থাৎ ইহাই বিশুদ্ধির পথ অর্থাৎ নির্বাণের পথ। এ-সমুদায় স্থলে 'বিসুদ্ধি'কে নির্বাণ বলা অযৌক্তিক নহে, কারণ এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে এই মার্গকে 'নিব্বান-গমনং মগ্গং' অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্তির পথ (২৮৯) বলা হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে বিসুদ্ধি নির্বাণেরই প্রতিশব্দ।

আর নির্বাণ বলিতে বুঝাইতেছে যে, ইহা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, তৃষ্ণাক্ষয়; ইহা সর্বপ্রকার পাপতাপের অতীত অবস্থা। এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই এই-সমুদায় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে— অনাসব (সং।৩; পা।৩০); আরোগ্য (=রোগবিহীনতা, ৭।৩); অ-গণ্ড (৭।৪); নিঃশল্য (পা।৫); অনঘ (পা।৬); অনাবাধ (পা।৭), অনুপদ্রব্য (পা।১১); অনুপসর্গ (পা।১৩); অনাদীনব (পা।২৪), অনঘ (পা।৬), অনঘমূল (পা।২৭), অব্যাধি (পা।৩৫); অসংক্লিষ্ট (পা।৪০) ইত্যাদি।

১৩. সু-দুর্দর্শ॥ নির্বাণকে দুর্দর্শ (মজ্ঝিম ১।১৬৭) এবং সুদুর্দর্শ (সং ৭) বলা হইয়াছে। মুক্তাবস্থা 'গম্ভীর, অপ্রমেয় এবং দুরবগাহ্য'। —মজ্ ১।৪৮৭, সংযুক্ত ৪।৩৭৬।

উপনিষদের ব্রহ্মও দুর্দর্শ (কঠ ২।১২); সূক্ষ্ম (মৈত্রী ২।৫), সু-সূক্ষ্ম (মুণ্ডক ১।১।৬), সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর (মু ৩।১।৭); অদৃশ্য, অগ্রাহ্য (মুঃ ১।১।৬; মা, ৭) ইত্যাদি।

১৪. নিষ্প্রপঞ্চ॥ নির্বাণ নিষ্প্রপঞ্চ (সং।১২)। দেশকালে প্রকাশিত জগৎকে প্রপঞ্চ বলা হয়। নির্বাণ এই প্রপঞ্চের অতীত। এক স্থলে ইহাকে 'নিষ্প্রপঞ্চপদ' বলা হইয়াছে। —অঙ্গুত্তর ৩।২৯৪।

উপনিষদের ব্রহ্মও 'প্রপঞ্চোপশমং' (মাণ্ডুক্য ৭) অর্থাৎ প্রপঞ্চের উপশম।

১৫. অনিদর্শন॥ কোনো লক্ষণ দ্বারা নির্বাণকে সম্যক্‌রূপে বর্ণনা

করা যায় না, এই জন্য ইহাকে অ-নিদর্শন (সং।১১) বলা হইয়াছে। ইহার একটি নাম 'অনিমিত্ত' (ধম্মপদ, ৯২, ৯৩; সুত্তনিঃ ৩৪২)। 'নিমিত্ত' অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ, যাহা চিহ্ন-বৰ্জিত বা লক্ষণ-বর্জিত, তাহাই অনিমিত্ত। নির্বাণ 'অনাখ্যাত' (ধম্মপদ, ২১৮)। যাহাকে কোনোপ্রকারে ব্যাখ্যা বা নির্দেশ করা যায় না, তাহাই অনাখ্যাত।

উপনিষদের ব্রহ্মেরও এই প্রকার ভাব। মাণ্ডুক্য উপনিষদে (৭) ব্রহ্মকে "অ-লক্ষণং" বলা হইয়াছে। অ-নিদর্শন এবং অলক্ষণ একই ভাব।

১৬. মহাশূন্য॥ নির্বাণকে শূন্য (ধম্মপদ, ৯২, ৯৩) এবং মহাশূন্য (পা।২২) বলা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় 'শূন্য' বলিলে 'অবস্তু' এবং সর্ব-প্রকার 'অস্তিত্ব-বিহীনতা' বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহার অন্য অর্থ।

(ক)

ধম্মপদে (৯২, ৯৩) 'শূন্যতঃ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকায় বলা হইয়াছে যে, ইহা নির্বাণের বিশেষণ এবং নির্বাণ রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য এবং মোহশূন্য, এই জন্য ইহাকে শূন্য বলা হইয়াছে।

(খ)

বুদ্ধের সময়ে লোকে সাধারণতঃ পঞ্চস্কন্ধকে আত্মা বলিত। কিন্তু বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন যে পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য ও দুঃখময়; সুতরাং ইহা কখনও আত্মা হইতে পারে না। নির্বাণে এ প্রকার আত্মা বা আত্মত্ব নাই। যাহা এই প্রকার আত্মভাব শূন্য, বুদ্ধের মতে তাহাই শূন্য। —সংযুক্ত ৪।৫৪।

(গ)

মজ্‌ঝিম-নিকায়ে (৩।১০৪-১০৯) বুদ্ধ শূন্যতা এবং শূন্যতা-সাধন বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত এই— মনে কর, এক ব্যক্তি অরণ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছে। অরণ্য গ্রাম নহে, জনাকীর্ণ নহে।

সুতরাং অরণ্য গ্রামশূন্য এবং জনশূন্য। কিন্তু তাহার মনে তখনও অরণ্যত্বের ভাব বর্তমান। অরণ্যত্বের ভাব দূর করিলেও তাহাব মনে এই ভাব থাকে ইহাও পৃথিবী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শূন্যত্ব হইতে শূন্যতর অবস্থায় প্রবেশ করা যায়। বুদ্ধ 'পরিশুদ্ধ, পরম অনুত্তর, শূন্যত্ব' সাধন করিতেন এবং এই অবস্থায় বিহার করিতেন।

নির্বাণ পবম শূন্য— ইহার অর্থ এই যে, ইহার মধ্যে কোনো প্রকার 'বিষয়-বিষয়ী' ভাব নাই, ইহা দেশকাল শূন্য, সর্বপ্রকার ব্যাবহারিক সত্তাশূন্য, পঞ্চস্কন্ধ শূন্য— সংজ্ঞা অসংজ্ঞা প্রভৃতি সর্বভাব শূন্য। এইজন্য নির্বাণকে শূন্য বলা হইয়াছে।

(ঘ)

বুদ্ধপ্রোক্ত বিমোক্ষের আটটি অবস্থা (মহাপরি, ৩।৩৪, অঙ্গুত্তর ৪।৩০৬ ইত্যাদি)। পঞ্চম অবস্থায় এই জ্ঞান হয় যে, "সমুদায়ই অনন্ত বিজ্ঞান"। এই প্রকার সংজ্ঞা অতিক্রম করিলে ষষ্ঠ অবস্থায় প্রবেশ করা যায়। এই স্তরে "আকিঞ্চন্য আয়তন" এই প্রকাব সংজ্ঞা হয় অর্থাৎ এই প্রকার অনুভূতি হয় যে, 'কিছুই নাই'। 'আকিঞ্চন্য'— অর্থ 'কিছুই নাই' এই প্রকার ভাব। ইহার পরে সপ্তম ও তাহার পরে অষ্টম অবস্থা সংজ্ঞাও নাই এবং অসংজ্ঞাও নাই— ইহাই সপ্তম অবস্থার ভাব। ষষ্ঠ অবস্থার 'আকিঞ্চন্য' ভাব যদি অবস্তু বা আত্যন্তিক বিনাশের অবস্থা হইত তাহা হইলে আর সপ্তম ও অষ্টম অবস্থায় প্রবেশ কবা সম্ভব হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে 'আকিঞ্চন্য' বা শূন্যত্ব বলা হয়, তাহা অবস্তু বা আত্যন্তিক বিনাশ নহে।

(ঙ)

বুদ্ধপ্রোক্ত ধ্যানের নয়টি স্তর (মজ্‌ঝিম, ১।১৭৪ ; এবং বহু স্থলে)। সপ্তম স্তরের ভাব 'আকিঞ্চন্য' অর্থাৎ 'কিছুই নাই' এই ভাব। এই

অবস্থার সাধক আকিঞ্চন্যের অর্থাৎ শূন্যত্বের রাজ্যে বিহার করেন। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার পর অষ্টম স্তর। বুদ্ধ সপ্তম স্তর হইতে অষ্টম স্তরে অধিরোহণ করিতে পারিতেন এবং অষ্টম স্তর হইতে আবার সপ্তম স্তরের শূন্যায়তনে অবরোহণ করিতেন (মহাপরি, ৬।১১-১৩)। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শূন্যত্ব অর্থ আত্যন্তিক বিনাশ নহে।

কোনো কোনো উপনিষদেও ব্রহ্মকে 'শূন্য' এবং নিরাত্মা বলা হইয়াছে। মৈত্রেয়ী উপনিষদে এই প্রকার আছে--

"সঃ বৈ এষঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ, অপ্রাণঃ নিরাত্মা অনন্তঃ অক্ষয্যঃ স্থিরঃ শাশ্বতঃ অজঃ, স্ব-তন্ত্রঃ" (২।৪)।

অন্যত্র আছে—"সঃ অয়ং শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ" ইত্যাদি (ঐ ৬।৩১)।

নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় উপনিষদে (৬) এবং তেজো বিন্দু উপনিষদেও (১১) ব্রহ্মকে 'শূন্য' বলা হইয়াছে।

মৈত্রেয়ী উপনিষদে ব্রহ্মকে যে 'নিরাত্মা' বলা হইয়াছে ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়। সম্ভবতঃ এ স্থলে বৌদ্ধ অর্থে 'নিরাত্মা' ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাহাকে 'আত্মা' বলে ব্রহ্ম সে 'আত্মা' নহেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে গোতমের ধর্মে শূন্য অর্থ আত্যন্তিক বিনাশের অবস্থা নহে; ইহা ব্যাবহারিক সত্তার বিনাশ। ইহাও দেখা গেল কোনো কোনো উপনিষদে ব্রহ্মকেও শূন্য বলা হইয়াছে।

১৭. বিজ্ঞানাতীত॥ বুদ্ধের মতে জ্ঞান বা বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্ভূত। সুতরাং নির্বাণকে কখনও জ্ঞানস্বরূপ বলা যাইতে পারে না। নির্বাণ জ্ঞানের অতীত অবস্থা।

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ কিনা এ বিষয়ে উপনিষদে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সাধারণ মত 'ব্রহ্ম জ্ঞানং'— ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান আছে অপর বস্তুর জ্ঞানও আছে। দ্বিতীয়তঃ, যাজ্ঞবল্ক্যের মত; তিনি বলেন, ব্রহ্ম জ্ঞাতা

কিন্তু এমন কোনো বস্তু নাই যাহা তিনি জানিবেন (বৃহঃ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫ ; ৪।৩।২৩-৩১)। জ্ঞেয় বিষয় নাই অথচ বলা হইতেছে জ্ঞাতা আছে। এ-সমুদায় অর্থবাদ। এ জ্ঞাতৃত্বও যাহা, জ্ঞানাতীত অবস্থাও তাহাই। তৃতীয়তঃ, মাণ্ডুক্য উপনিষদের মত, এই উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, তুরীয় ব্রহ্ম "অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, এবং উভয় প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন" (৭)।

এ মত যাজ্ঞবল্ক্যের মতেরই পূর্ণ বিকাশ।

উপনিষদের মত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, তুরীয় ব্রহ্ম এবং নির্বাণ একই। এতদুভয়ের মধ্যে কাহারও বিজ্ঞান বা জ্ঞান-কর্তৃত্ব নাই।

১৮. নেতি, নেতি ॥ ব্রহ্ম বিষয়ে বলা হইয়াছে 'নেতি' 'নেতি'— ইহা নয়, ইহা নয়। —বৃহ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২ ; ৪।৫।১৫ ইত্যাদি।

নির্বাণ বিষয়েও এই প্রকার বলা হইয়াছে।

উদান নামক গ্রন্থে (৮।১) এইরূপ আছে—

"হে ভিক্ষুগণ! এমন এক আয়তন আছে, যাহাতে পৃথিবী নাই, জল নাই, তেজ নাই, যাহাতে আকাশের অনন্ত আয়তন নাই, বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন নাই ; আকিঞ্চন্যের (অর্থাৎ কিছুই নাই এই অবস্থার) আয়তন নাই, সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞার আয়তন নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র সূর্য এতদুভয়ও নাই। হে ভিক্ষুগণ! আমি ইহাকে আগমনও বলি না, গমনও বলি না ; স্থিতিও বলি না, চ্যুতিও বলি না এবং উপপত্তিও বলি না। ইহা প্রতিষ্ঠা-বিহীন, প্রবর্তন-বিহীন ও নিরালম্ব ; এবং ইহাই দুঃখের অন্ত"।

ঐ গ্রন্থেরই অন্য এক স্থলে (১।১০) মুক্ত অবস্থা বিষয়ে এই প্রকার বলা হইয়াছে—

"যখন ব্রাহ্মণ মুনি মৌনাবলম্বন করিয়া আত্মাকে অবগত হয়েন (অ ত্ত না বে দি), তখন সে অবস্থাতে পৃথিবী তেজ, বায়ু স্থানপ্রাপ্ত হয় না, সে স্থলে জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ প্রদান করে না, আদিত্য সে স্থলে প্রকাশিত হয় না, সে স্থলে চন্দ্র আলোক বিস্তার করে না এবং অন্ধকারও সে স্থলে বর্তমান নাই। তখন তিনি রূপ ও অরূপ, সুখ ও দুঃখ এই-সমুদায় হইতেই প্রমুক্ত হয়েন।"

নির্বাণ ইহলোকেই লাভ হউক বা পরলোকেই লাভ হউক— নির্বাণের প্রকৃতি একই।

নির্বাণ-বিষয়ে যাহা পাওয়া গেল ব্রহ্ম বিষয়েও তাহাই উক্ত হইয়াছে—

"ন তত্র সূর্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥"

মুণ্ডক ২।২।১০ ; কঠ ৫।১৫ , শ্বেত ৬।১৪।

"সে স্থলে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কোথায়?"

নৃসিংহ পূর্বতাপনীয় উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি। ইহাতে পরম পদের বর্ণনা এই—

"যেখানে সূর্য উত্তাপ দেয় না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, চন্দ্রও কিরণ প্রদান করে না, নক্ষত্রসমূহ প্রকাশ পায় না, যেখানে অগ্নি দহন করে না, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে না, যেখানে দুঃখ নাই" ইত্যাদি ৫।৮।

নির্বাণ ও ব্রহ্ম উভয়ই দেশকালের অতীত। ব্যাবহারিক সত্তার কোনো গুণই নির্বাণ বা ব্রহ্মে আরোপ করা যায় না। এইজন্য ইহাদিগকে বর্ণনা করিবার সময় বলিতে হয় 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' ইহাতে 'ইহা নাই', 'ইহা নাই'।

এই-সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অবর বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই —নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান। শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩২। শিল্পকথা। শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

সচিত্র

* সচিত্র



* সচিত্র

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১॥০

ইতিহাস ২॥০, ৩৲

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয়

পদার্থবিদ্যার নব

শ্রীনির্মলকুমার ব

হিন্দুসম

শ্রীসত্যে

শ্রী